Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বিভ্রান্তি অপোনেদন ও অবিশ্বাস নিরসন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা: রেখা ইয়াসমিন

রোলঃ ২১৫০০০৬৯

১০ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বিভ্রান্তি অপোনেদন ও অবিশ্বাস নিরসন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা: রেখা ইয়াসমিন

রোলঃ ২১৫০০০৬৯

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "বিভ্রান্তি অপোনেদন ও অবিশ্বাস নিরসন" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছা: রেখা ইয়াসমিন, আইডিঃ ২১৫০০০৬৯ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

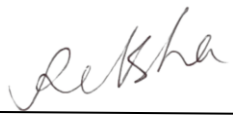
এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " বিভ্রান্তি অপোনেদন ও অবিশ্বাস নিরসন " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।



(স্বাক্ষর)

মোছা: রেখা ইয়াসমিন

আইডিঃ ২১৫০০০৬৯

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
সার সংক্ষেপ	৭
উৎসর্গ	৯
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	১০
প্রথম অধ্যায়	১১
ভূমিকা	১১
গবেষণার যৌক্তিকতা	১২
গবেষণার লক্ষ্য	১২
গবেষণার উদ্দেশ্য	১২
গবেষণা প্রশ্ন	১৩
গবেষণার প্রত্যয় সমূহের সংজ্ঞা	১৩
নাস্তিক্যবাদ -অন্যান্য নাম	১৫
অজ্ঞেয়বাদ (Agonist)	১৬
নাস্তিক্যবাদের প্রতীক	১৭
গবেষণার সীমাবদ্ধতা	১৭
দ্বিতীয় অধ্যায় : গবেষণার রূপরেখা	১৯
গবেষণা পদ্ধতি	১৯
তৃতীয় অধ্যায় : সংশ্লিষ্ট পুস্তক পর্যালোচনা	২০
ধর্ম ও দর্শনের আলোকে আস্তিক ও নাস্তিক	২০
চতুর্থ অধ্যায় : নাস্তিকতার স্বরূপ	২৬
নাস্তিকতার প্রকার	২৬
নাস্তিকতা বনাম ধর্ম: কেস স্টাডি (আমেরিকা)	২৭
সম্পদ এবং শিক্ষা এর সাথে নাস্তিকতার আন্তঃসম্পর্ক	২৮
নাস্তিকদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী	২৯
নাস্তিকরা কী ইসলাম বিদ্বেষী হয়	৩০
নাস্তিকতার পরিমাপক: কেস স্টাডি (আমেরিকা)	৩০
নাস্তিকতার জনসংখ্যা	৩৬
নাস্তিক থেকে আস্তিক : কেস স্টাডি	৩৮
পঞ্চম অধ্যায়: উপাত্ত বিশ্লেষণ	৪২
৫.১ নাস্তিক ও ইসলাম বিদ্বেষীদের বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন ও জবাব	৪২
স্রষ্টার কি অস্তিত্ব আছে?	৪২

প্রশ্ন-১:স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করল?	
প্রশ্ন-২ আল্লাহ দয়ালু হলে জাহান্নাম কেন বানালেন?	
প্রশ্ন-৩ মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে স্রষ্টার কোনো দরকার আছে? মহাবিশ্ব শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে?	
প্রশ্ন-৪ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কী সত্যিই ৩ টা সূরাকে কুরআন এর অংশ বলে মানতেন না?	
প্রশ্ন-৫ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কী সত্যিই ৩ টা সূরাকে কুরআন এর অংশ বলে মানতেন না?	
প্রশ্ন-৬ আল্লাহ রিজিকদাতা হলে মানুষ না খেয়ে মারা যায় কেন?	
প্রশ্ন-৭:আল্লাহ যদি অভাবগ্রস্থ না হন তাহলে ঋন চাইলেন কেন?	
প্রশ্ন-৮:কোরআনের মত কোনো বই নাকি লেখা সম্ভব না? কোরআন তো চ্যালেন্জ দিয়াই খালাস, এই চ্যালেঞ্জ জাস্টিফাই করবে কে?	
প্রশ্ন-৯ আল্লাহ যত নবী পৃথিবীতে প্রেরন করেছেন,তাদেঁর মধ্যে একজনও কেন মহিলা নেই? পুরুষকে কেন নবী হিসাবে পাঠানো হয়েছে?	
প্রশ্ন :১০-যদি আল্লাহর ইচ্ছাই সব হয়ে থাকে তাহলে নিজের ইচ্ছা বলতে কি কিছুই নেই?	
প্রশ্নঃ১১ ইসলাম আকার বা মূর্তি পূজাকে প্রত্যাখ্যান করে কিন্তু তারা নিজেরাই কেন প্রার্থনায় কাবার প্রতি নত হয়ে তার উপাসনা করে?	
প্রশ্ন:১২ -মুসলিমগন কুরআনের আয়াত রহিতকরন বিস্বাস করেন তার মানে- সুষ্টিকর্তা ভুল করেছেন ও পরবর্তীতে সংশোধন করেছেন?	
প্রশ্ন :১৩ - যদি আল্লাহ কাফেরদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেন তবে তাদের কেন দোষী সাবস্ত্য করা হয়?	
প্রশ্ন :১৪ - যদি আল্লাহ কাফেরদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেন তবে তাদের কেন দোষী সাবস্ত্য করা হয়?	
প্রশ্ন :১৫ ইসলাম কি বহু খোদায় বিস্বাস করে কারন অনেক স্থানে আমি-র পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করা হয়েছে?	
প্রশ্ন :১৬ আল্লাহকে প্রশংসা করা কি প্রয়োজন? না করলে তিনি কেন আমাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন তবে তিনি কি করে রহিম হলেন?	
প্রশ্নঃ১৭ বিজ্ঞান আমাদের বলে, যে যা খায় তার আচরণে তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। তাহলে ইসলাম কেন মুসলিমদেরকে আমিষ	

খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দেয়। যেখানে পশুর মাংস ব্যক্তিকে হিংস্র ও দুঃসাহসী করে তুলতে পারে?	
প্রশ্ন :১৮ -আল-কুরআন সংকলন করা হয়েছে তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ) এর আমলে। তাহলে কিভাবে আল্লাহর আয়াত বলা যায়?	
প্রশ্নঃ১৯- ইসলাম একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয় কেন? অথবা ইসলামে বহু-বিবাহ অনুমোদিত কেন?	
প্রশ্ন-২০ ইসলামে শূকর খাওয়া হারাম কেন? অথচ শূকর আল্লাহরই একটি সৃষ্টি। হারামই যদি হয় তাহলে আল্লাহ শূকরকে সৃষ্টি করলেন কেন?	
প্রশ্ন:২১ আল্লাহ যদি সর্বশক্তিমান এবং পরম করুনাময় হন, তাহলে পৃথিবীতে এত দু:খ-কষ্ট কেন?	
নাস্তিককে আস্তিক এ পরিণত করার উপায় উপায়	১৩০
স্রষ্টার অস্তিত্ব এর প্রমাণ:	১৩০
আল্লাহর সাহায্য ও হেদায়েত :	১৩০
গবেষণার ফলাফল ও সিদ্ধান্ত	১৩২
নাস্তিকতা এবং বিশ্বাস ও ধর্ম:	১৩২
আস্তিক ও নাস্তিক এর মাঝে পার্থক্য	১৩২
নাস্তিকতা ও সর্বাত্মকবাদ	১৩২
নাস্তিকতার ধরন	১৩৫
উপসংহার	১৩৮
গ্রন্থপঞ্জি	১৩৯

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ [৩:৮

"হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্যলংঘনে প্রবৃত্ত করোনা এবং তোমার নিকট থেকে আমাদিগকে অনুগ্রহ দান কর। তুমিই সব কিছুর দাতা।" [সূরা আলেইমরান-৩: ৮]

সার সংক্ষেপ

নাস্তিক শব্দের সবচেয়ে কাছের শব্দটি হলো কুফর। কুফর শব্দটি সাধারণভাবে ঈশ্বরকে নির্দেশ করে না। সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি অনাস্থা/অবিশ্বাস/অংশীদ্বারকে নির্দেশ করে। 'কুফর' হচ্ছে আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় হিসাবে অস্বীকার করা। এ ক্ষেত্রে আল্লাহকে অস্বীকার করে অন্য কোন ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করলেও সে কাফির। শিরক হচ্ছে অংশীদার করা- অর্থাৎ আল্লাহর গুনসমূহে অন্য কাউকে অংশীদার করলে তা হয় শিরক। এ বিশ্লেষণে পৌত্তলিকতা বা মূর্তি-পূজা শিরক। এই শিরককে কিন্তু ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ হিসাবে ইসলাম ধর্মে গণ্য করা হয়েছে। অপরদিকে 'মোনাফেকি'ও আল্লাহকে অবিশ্বাস- কিন্তু এটা হলো তাদের ক্ষেত্রে যারা মুখে বা উপরে-উপরে বিশ্বাস প্রদর্শন করে কিন্তু অন্তরে অবিশ্বাস ধারণ করে। প্রচলিত অর্থে শব্দটিকে বিশ্লেষণ করা যাক। ধর্ম পালনকারীদের সাধারণভাবে নাস্তিক বলা হয় না। (ধর্মে ঈশ্বরকে অস্বীকার করা হলেও) অনেক সময়ই পৈত্রিক ধর্মকে অস্বীকারকারীকে নাস্তিক বলা হয়। একজন মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী কেউ হিন্দুধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুললে বা হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণকারী একজন ইসলামধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন তুললে, তাকে হয়তো নাস্তিক বলা হয় না। যখন কেউ তার পৈত্রিক ধর্মের বিভিন্ন বিশ্বাস নিয়ে ক্রমাগত প্রশ্ন তুলতে থাকে এবং নতুন কোন ধর্মে নিজেকে সমর্পিতও না করে- তখন তাকে কখনও কখনও নাস্তিক বলে অভিহিত করা হয়।

নাস্তিক বিশ্বাসের মৌলিক শ্রেণী তিনটি। যথা-(1) ইস্যুতে কোনো অবস্থান না নিয়েই আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস; (2) অজ্ঞেয়বাদী-নাস্তিকতা, কিছু মাত্রায় অবিশ্বাস প্রকাশ করা

কিন্তু জ্ঞানের দাবি ছাড়াই (সন্দেহবাদ); এবং(3) জ্ঞানবাদী-নাস্তিকতা, দৃঢ়ভাবে একটি স্রষ্ঠার অস্তিত্বকে প্রত্যাখ্যান করে ...

নাস্তিকরা সাধারণত যে দেশে বসবাস করে সে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠদের ধর্মের সমালোচনা বেশি করে থাকে। কারণ সেই দেশের সমাজ ব্যাবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠদের ধর্মের প্রভাব বেশি থাকে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সেটা ইসলাম। ভারতের ক্ষেত্রে সেটা সনাতন ধর্ম। আমেরিকার ক্ষেত্রে খ্রিষ্ট ধর্ম।

মানসিকতার ধরন এ নাস্তিকদের মধ্যে বিভাজন আছে। তাদের সবাই মুসলিমদেরকে বাক্যবাণ এ জর্জরিত করে না, সবার ভাষা কুরুচিপূর্ণ, অশ্লীল হয় না। কিছু নিরব থাকে।

নাস্তিকরা মূলত সুপ্ত অবস্থার আস্তিক। তারা ধর্ম না মানলেও ধর্ম সচেতন।

কুরআনুল কারীমে সূরা ইয়াসিন এর ৬,১০,১১ নম্বর আয়াতগুলো স্পষ্ট যে নাস্তিকদের কেবল আমরা সতর্ক করতে পারি। দাওয়াহ দিতে পারি। আল্লাহ তাআলার হেদায়েত ছাড়া তারা কখনো আস্তিক হতে পারবে না। আস্তিকতার প্রশ্নে নাস্তিকদেরকে কুরআন মাজীদ এর দিকে ফেরানো ও স্রষ্টার অস্তিত্ব এর প্রমাণ দিয়ে আল্লাহর সাথে সম্পর্কস্থাপন করে দেওয়া অতীব জুরুরি।

উৎসর্গ:

ইসলামিক অইলাইন মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ও প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট দায়ী ও গবেষক ওস্তাদজী মুফতি জুবায়ের আহমাদ হাফিযাহুল্লাহ এর উদ্দেশ্যে। যার দোয়া ও অকৃত্রিম ভালবাসার ডোরে বাধা ইসলামিক অনলাইন পরিবার।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

আমি প্রথমে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার সৃষ্টিকর্তা পরম দয়ালু মহান রাব্বুল আলামীনের প্রতি। আল্লাহর অশেষ রহমতে নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ধৈর্য্য ধরে আমি আমার গবেষণা কর্মটি সমাপ্ত করতে পেরেছি।

আমি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার তত্ত্বাবধায়ক খন্দকার মারসুস ওস্তাদজী কে। যিনি আমাকে দাওয়াহ এর ক্ষেত্রে গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করার সুযোগ করে দিয়েছেন। যে কর্মের মাধ্যমে আমার রবের সাথে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়েছে;আল্লাহর দয়া, মাহাত্ম্য ও বড়ত্ব অনুধাবন করে বারবার অশ্রু সিক্ত হয়েছে। গবেষণাকর্মটির প্রস্তাবনা প্রণয়ন থেকে অভিসন্দর্ভ জমা দেওয়া পর্যন্ত সময়টিতে নির্দেশনা দিয়েছেন।

শ্রদ্ধাভরে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি সাইফুদ্দিন শাকিল ওস্তাদজী কে। ওস্তাদজীর স্নেহশীল দিকনির্দেশনা ও উৎসাহমূলক কথা আমাকে গবেষণা করতে অনুপ্রাণিত করেছে।

কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি দাওয়াহ গ্রুপ এর নাস্তিক বিষয়ক উপগ্রুপের শারমিন আক্তার ঝুমা ও আসমাউল হুসনা সুপ্তি আপু কে। যারা আমাকে তথ্য উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তাদের প্রতি যারা আমার গবেষণা পত্রটি প্রিন্ট ও বাইন্ডিং করে মাদ্রাসায় পৌঁছে দিয়েছেন।

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা:

اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ

"তুমি তো কেবল তাকেই সতর্ক করবে যে উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখেও পরম করুণাময় আল্লাহকে ভয় করে। অতএব তাকে তুমি ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের সুসংবাদ দাও।" (সূরা ইয়াসিন, ৩৬:১১)

আস্তিক ও নাস্তিক বলতে সাধারণত যথাক্রমে সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী কে নির্দেশ করে। শব্দ দুটি সবসময় একই অর্থ বহন করে না।

নাস্তিক্যবাদ বিশ্বাস তো নয়ই বরং অবিশ্বাস ও যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বাসকে খণ্ডন নয় বরং বিশ্বাসের অনুপস্থিতিই এখানে মুখ্য। শব্দটি মূলত সেই সকল মানুষকে নির্দেশ করে যারা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নেই বলে মনে করে এবং প্রচলিত ধর্মগুলোর প্রতি বিশ্বাস কে ভ্রান্ত বলে স্বীকার করে।

ইসলামে আস্তিক শব্দের ব্যাখ্যা হচ্ছে- মু'মিন বা ঈমানদার। এই ঈমান হলো সর্বশক্তিমান আল্লাহতে বিশ্বাস। আল্লাহর রাসুল হিসাবে মুহাম্মাদ সা. এর উপরও বিশ্বাস (কালেমা তাইয়েবা)। আস্তিকতা নির্নীত হয় আধ্যাত্মিকতার নীরিক্ষে, নাস্তিকতা বস্তুবাদ নীরিক্ষে।

নাস্তিকরা যে দেশে যে ধর্মের মানুষের আধিক্য থাকে সেদেশে সেই ধর্মের বিভিন্ন বিষয় এ বিদ্বেষ পোষণ করে, বিভ্রান্তি ছড়ায়। যেমন,ভারত এর নাস্তিকরা হিন্দু ধর্মের, আমেরিকার নাস্তিকরা খ্রীস্টধর্মের বাংলাদেশের নাস্তিকরা ইসলাম ধর্মের অনেক বিষয়ে বিভ্রান্ত ছড়ায়, বিষোদগার করে। তবে সব নাস্তিক এমন নয়। এরা পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে থাকে। এদের পক্ষপাতদুষ্ট লেখা ও বক্তব্য কখনও স্বল্পজ্ঞান এর আস্তিক কে আবার কখনও কখনো অজ্ঞেয়বাদীকে নাস্তিকে পরিণত করে।

গবেষণার যৌক্তিকতা

নাস্তিক শব্দটি মূলত সেই সকল মানুষকে নির্দেশ করে যারা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নেই বলে মনে করে এবং প্রচলিত ধর্মগুলোর প্রতি বিশ্বাস কে ভ্রান্ত বলে স্বীকার করে।

নাস্তিকরা দুনিয়া আখিরাত দুইটাকেই বরবাদ করে ফেলে। ধর্মীয় অবিশ্বাসের সাথে তারা অনেকেই নীতি নৈতিকতা বিসর্জন দেওয়ায় অন্যের অনিষ্ট এর কারণ হয়ে থাকে। তাদের অনেকের দ্বারা ধর্মের উপর যে বিভ্রান্তি ছড়ান হয়ে থাকে তা ধর্মীয় মূল্যবোধ এর উপর আঘাত ঘটার নামান্তর। তাই আদম সন্তান হিসাবে এই নাস্তিক ভাই বোনকে জাহান্নাম হতে জান্নাতি পথে সীরাতিম মুস্তাকিম এ পরিচালনা করার মাধ্যম আবিষ্কার এ এবং ইসলামের উপর বিশোদগার -বিভ্রান্তি দূর করতে, নাস্তিক কর্তৃক একজন আস্তিক কে সংশয়বাদী ও নাস্তিক এ পরিণত করা রোধ ও নাস্তিকের অবিশ্বাস নিরসনকল্পে আলোচ্য গবেষণা কার্য সম্পাদন এর যৌক্তিকতা রয়েছে।

গবেষণার লক্ষ্য

নাস্তিক ও ইসলাম বিদ্বেষীদের দাওয়াহ প্রদান।

গবেষণার উদ্দেশ্য

১) নাস্তিকতার স্বরূপ উন্মোচন করা।

২) নাস্তিক ও ইসলাম বিদ্বেষীদের বিভ্রান্তির অপোনেদন করা।

৩) অবিশ্বাসীদের দাওয়াহ দেওয়ার কার্যকরী পদ্ধতি উপস্থাপন।

গবেষণা প্রশ্ন:

১) নাস্তিকতার ধরন কীরূপ?

২) অবিশ্বাসীরা কী ইসলাম ধর্মের উপর বিভ্রান্তি ছড়ায়?

৩) নাস্তিকতা কী সহজাত?

৪) নাস্তিকতার প্রভাবক বিষয়গুলো কী কী?

গবেষণার প্রত্যয় সমূহের সংজ্ঞা

নাস্তিকতা ও নাস্তিক্যবাদ :

গ্রীক শব্দ αθεοι (atheoi) তৃতীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইফিষীয়দের ২:১২ প্যাপিরাস ৪৬-এ দেখা যায়। এর ইংরেজি অনুবাদ হলো "(যারা) ঈশ্বর বিহীন।"

প্রারম্ভিক প্রাচীন গ্রিক ভাষায়, বিশেষণ átheos (ἄθεος, ব্যক্তিগত ἀ- + θεός থেকে "ঈশ্বর") অর্থ "ঈশ্বরহীন"। এটি প্রথমে কুৎসা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিলো, মোটামুটিভাবে যার অর্থ ছিলো "অধার্মিক" বা "অপরাধী"। খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীতে, শব্দটি "ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা" বা "ঈশ্বরকে অস্বীকার করা" অর্থে অধিক ইচ্ছাকৃত এবং সক্রিয় ঈশ্বরহীনতা নির্দেশ করতে শুরু করে। এরপর ἀσεβής (asebēs) শব্দটি যারা স্থানীয় দেবতাদের অসম্মান করেছিলো তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়েছিলো। এমনকি তারা অন্য দেবদেবীতে বিশ্বাস করলেও এই শব্দটি প্রয়োগ করা হতো। ধ্রুপদী পাঠ্যের আধুনিক অনুবাদগুলো কখনও কখনও átheos কে "atheistic" বা নিরীশ্বরবাদী হিসেবে অভিহিত করে। একটি বিমূর্ত বিশেষ্য হিসাবে, ἀθεότης (atheotēs) ব্যবহৃত হতো যার অর্থ , "নাস্তিকতা"। সিসেরো গ্রীক শব্দটিকে ল্যাটিন átheos-এ লিপিবদ্ধ করেন। প্রারম্ভিক খ্রিস্টান এবং হেলেনিস্টদের মধ্যে বিতর্কে শব্দটি নিয়মিত ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় , যেখানে প্রতিটি পক্ষ একে অপরকে দোষারোপ করতো।

ইংরেজি "এথিস্ট" শব্দটি এসেছে (ফরাসী athée) থেকে, যার অর্থ "সে সব মানুষ, যারা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রত্যাখান করে",ইংরেজিতে এই শব্দের ব্যবহার খুঁজে পাওয়া যায় ১৫৬৬ সালের পূর্বভাগে এবং ১৫৭১ সালে। এথিস্ট শব্দটি ব্যবহারিক ভাবে ঈশ্বরবিহীন আখ্যা হিসেবে ১৫৭৭ সালে। ইংরেজি এথিজম পদবাচ্য এসেছে ফরাসি athéisme,থেকে এবং ইংরেজিতে ১৫৮৭ সালে তা প্রতীয়মান হয়। ১৫৩৪ সালে একটি এথিওনিজম হিসেবে একটি বিষয়ে নাস্তিক্যবাদকে প্রকাশ করা হয়েছিল। সমসাময়িক শব্দ হিসেবে: ১৬২১ সালে শ্বরবাদী,১৬৬২ সালে আস্তিক্যবাদ, ১৬৭৫ সালে শ্বরবাদ,এবং ১৬৭৮ সালে আস্তিক্যবাদ পদবাচ্যের উদ্ভব হয়।সেইসময় "শ্বরবাদ" এবং "শ্বরবাদী" পদব্যাচ্যের আধুনিক অর্থ উদ্ভূত হয়। আস্তিক্যবাদের সাথে শ্বরবাদের পার্থক্য এভাবেই উৎসররিত হয়।

ক্যারেন আর্মস্ট্রং লিখেছেন যে, "১৬ এবং সতেরো শতকে নাস্তিক্যবাদ শব্দটি শুধুমাত্র সম্পূর্ণভাবে বিতর্কিত তর্কশাস্ত্রীয় ছিল... সেসময় নাস্তিক্যবাদ পদবাচ্য টি একপ্রকার অপমানজনক শব্দ ছিল এবং কেউই নিজেকে নাস্তিক হিসেবে অভিহিত করার কথা স্বপ্নেও ভাবত না।"

নিজেকে নাস্তিক হিসেবে অভিহিত করার প্রথম ধাপ শুরু হয় ইউরোপে ১৮ শতকের শেষভাগে। সেসময় বিশেষত একেশ্বরবাদী আব্রাহামিক ঈশ্বরের প্রতি যে অবিশ্বাস তা প্রকাশ করাই ছিল নাস্তিকতা। বিশ শতকে বিশ্বায়নের মাধ্যমের এই শব্দের ব্যাপক বিস্তৃতির জন্য এর অর্থ দাঁড়ায় সর্বপ্রকার দৈবশক্তিতে অবিশ্বাস। যদিও বর্তমানে পশ্চিমা সমাজে শুধুমাত্র "ঈশ্বরে অবিশ্বাস"কেই সাধারণত নাস্তিক্যবাদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

নাস্তিক্যবাদ -অন্যান্য নাম:

‘নিরীশ্বরবাদ, নাস্তিকতাবাদ) (ইংরেজি: Atheism) একটি দর্শনের নাম যাতে ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয় না এবং সম্পূর্ণ ভৌত এবং প্রাকৃতিক উপায়ে প্রকৃতির ব্যাখ্যা দেয়া হয়। মূলত আস্তিক্যবাদ এর বর্জনকেই নাস্তিক্যবাদ বলা যায়।

নাস্তিক্যবাদ বিশ্বাস নয় বরং অবিশ্বাস এবং যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বাসকে খণ্ডন নয় বরং বিশ্বাসের অনুপস্থিতিই এখানে মুখ্য। শব্দটি সেই সকল মানুষকে নির্দেশ করে যারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই বলে মনে করে এবং প্রচলিত ধর্মগুলোর প্রতি বিশ্বাস কে ভ্রান্ত বলে তারা স্বীকার করে। দিনদিন মুক্তচিন্তা, সংশয়বাদী চিন্তাধারা এবং ধর্মসমূহের সমালোচনা বৃদ্ধির সাথে সাথে নাস্তিক্যবাদেরও প্রসার ঘটছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম কিছু মানুষ নিজেদের নাস্তিক বলে পরিচয় দেয়। বর্তমান বিশ্বের জনসংখ্যার ২.৩% মানুষ নিজেদের নাস্তিক বলে পরিচয় দেয় এবং ১১.৯% মানুষ কোনো ধর্মেই বিশ্বাস করে না।জাপানের ৩১% মানুষ নিজেদের নাস্তিক বলে পরিচয় দেয়। রাশিয়াতে এই সংখ্যা প্রায় ১৩% এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন এর দেশগুলোতে ১২% নাস্তিক, (৬% শুধুমাত্র ইতালিতেই) থেকে শুরু করে ৪৬% থেকে ৮৫% (সুইডেন) মত।

পশ্চিমের দেশগুলোতে নাস্তিকদের সাধারণ ভাবে ধর্মহীন বা পারলৌকিক বিষয় সমূহে অবিশ্বাসী হিসেবে গণ্য করা হয়। কিছু নাস্তিক ব্যক্তিগত ভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা, হিন্দু ধর্মের দর্শন, যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ এবং প্রকৃতিবাদ, বস্তুবাদ ইত্যাদি দর্শনে বিশ্বাস করে। নাস্তিকরা মূলত কোনো বিশেষ মতাদর্শের অনুসারী নয় এবং তারা সকলে বিশেষ কোন আচার অনুষ্ঠানও পালন করে না। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভাবে যে কেউ, যেকোনো মতাদর্শে সমর্থক হতে পারে, নাস্তিকদের মিল শুধুমাত্র এক জায়গাতেই, আর তা হল ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব কে অবিশ্বাস করা।

অজ্ঞেয়বাদ (Agonist):

নাস্তিক্যবাদ সম্পর্কে যথোপযুক্ত বোঝার জন্য অজ্ঞেয়বাদ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

Agonist বা অজ্ঞেয়বাদীরা ও তাদের লেখা বই একজন আস্তিককে নাস্তিক এ পরিণত করে। কখনো একজন ব্যক্তি এই অজ্ঞেয়বাদ এর স্তর থেকে আস্তিকতার স্তর এ উন্নীত হয়, আবার ব্যতিক্রমও ঘটে। অর্থাৎ অজ্ঞেয়বাদ থেকে নাস্তিকতার দিকে ধাবিত হয়।

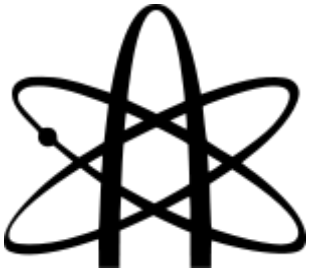
এটি এমন একটি দার্শনিক চিন্তা অথবা মতবাদ বা ধারণা যেখানে বলা হয় যে, কোন ঈশ্বর বা কোনো পরমসত্ত্বা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব বা নিরস্তিত্ব উভয় মানুষের অজানা এবং এটি তাদের দ্বারা কখনো জানা সম্ভব হবেনা। মার্কিন দার্শনিক উইলিয়াম এল. রোয়ে বলেন, "অজ্ঞেয়বাদ হচ্ছে, মানবজাতি কখনো ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তা যে আছেন এটা শক্তভাবে প্রমাণ করতে সমর্থ হবে না আবার ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তা যে নেই এটিও শক্তভাবে নিশ্চিত করতে অসমর্থ থেকে যাবে।

অজ্ঞেয়বাদ হল যুক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয়ে গঠিত একটি ধারণা; তবে এটি কোনো ধর্ম নয়। এটি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে না আবার স্বীকারও করে না। ইংরেজ জীববিজ্ঞানী টমাস হেনরি হাক্সলি 'অজ্ঞেয়বাদ' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন ১৮৬৯ সালে। টমাসের আগেকার চিন্তাবিদরাও অবশ্য নিজেদের মতবাদে অজ্ঞেয়বাদের প্রচার করেন, যেমন: সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্ত নামে খ্রিষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীর একজন ভারতীয় দার্শনিক যিনি প্রথমে 'পরকাল' সম্বন্ধে অজ্ঞেয়বাদ প্রকাশ করেন; ও পীথাগোরাস যিনি ৫ম শতাব্দীর গ্রিক দার্শনিক, তিনিও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞেয়বাদ প্রকাশ করেন। নাসদীয় সূক্ত' (একটি ভারতীয় মতবাদ) এবং ঋগ্বেদ পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারে অজ্ঞেয়।

নাস্তিক্যবাদের প্রতীক



এথিয়েস্ট অ্যালায়েন্স ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক অনুমোদিত **নাস্তিক্যবাদের প্রতীক:**



পারমাণবিক ঘূর্ণি , আমেরিকান এথিয়েস্টস কর্তৃক অনুমোদিত নাস্তিক্যবাদের প্রতীক।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

গবেষণা একটি জটিল দক্ষতা ও নৈপূন্য ভিত্তিক কাজ। এ কাজে প্রচুর সময় প্রয়োজন। আলোচ্য গবেষণা কার্য এর গবেষক এর প্রধান সমস্যা সময় স্বল্পতা।

নবীন গবেষক হিসাবে ও সময় স্বল্পতার জন্য গবেষণা কর্মটি সুনিপুণভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয় নি।

গবেষক সাধারণ ধারার শিক্ষাব্যবস্থা থেকে দ্বীনি ধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় খুবই নবীন। সুতরাং দ্বীনি বিষয় এ পর্যাপ্ত জ্ঞান এর স্বল্পতা এটাও তাহার অন্যতম সীমাবদ্ধতা।

গবেষক এ গবেষণা কার্য সম্পন্ন করেছেন কেবল দাওয়াহ এর উদ্দেশ্যে, পার্থিব কোন উদ্দেশ্যে নয়। যারা এটি পড়বেন তাদের কাছে জোর অনুরোধ থাকবে গবেষক এর সীমাবদ্ধতা, তাহার ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। দোয়া করবেন এই

থিসিস পেপার টি যেন আল্লাহর অনুগ্রহ এ আস্তিকদের মধ্যে সংশয়বাদীদেরকে নাস্তিক হওয়া থেকে রক্ষা করে ও নাস্তিকদেরকে আস্তিক এ পরিণত করে।

মোছা: রেখা ইয়াছমিন

দ্বিতীয় অধ্যায়

গবেষণার রূপরেখা

গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনায় অনুসৃত পদ্ধতি এই অধ্যায় এ উপস্থাপন করা হল:

গুণগত পদ্ধতি :

আলোচ্য গবেষণাটি একটি গুণগত গবেষণা। গবেষণাকর্ম টি সম্পাদনের ক্ষেত্রে গুণগত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। সসম্পূর্ণ গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালিত হয়েছে দ্বেতয়িক বিষয় এর উপর ভিত্তি করে। এখানে সরাসরি সাক্ষাৎকার কিংবা প্রশ্নাবলী তৈরির মাধ্যমে কোন উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় নি। বই পুস্তক, জার্নাল, পত্রিকা, ইন্টারনেট থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

পরিমাণগত পদ্ধতি :

গবেষণাকর্মটি গবেষক কর্তৃক গুণগত পদ্ধতিতে পরিচালিত হলেও বিভিন্ন ব্লগ বা ওয়েবসাইট থেকে পরিসংখ্যনভিত্তিক কেস স্টাডি বর্ণণা করায় পরিসংখ্যানিক তথ্যচিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : সংশ্লিষ্ট পুস্তক পর্যালোচনা

ধর্ম ও দর্শনের আলোকে আস্তিক ও নাস্তিকঃ

আস্তিক বলতে সাধারণভাবে বুঝি ঈশ্বর বিশ্বাসী এবং নাস্তিক বলতে বুঝি ঈশ্বর অবিশ্বাসী। এ বিষয়ে একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়- শব্দ দুটি সবসময় একই অর্থ বহন করে না। প্রশ্ন জাগতেপারে বেশ কিছু ধর্মে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই (জৈন, প্রথম অবস্থায় বৌদ্ধ, বিভিন্ন টোটেমদের ধর্ম) সেগুলোকে নিশ্চয় নাস্তিকধর্ম বা ঐ সব ধর্ম পালনকারীদের সাধারণভাবে নাস্তিক বলার উপায়ন্তর নেই। আবার, দর্শন শাস্ত্রে বিশেষত ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রমতে আস্তিক- নাস্তিকদের সংজ্ঞা অন্যরকম, কিছুটা মজারো বটে। ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়গুলোকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়- নাস্তিক ও আস্তিক।

নাস্তিক সম্প্রদায় তিন ভাগে বিভক্তঃ

১। চার্বাক

২। বৌদ্ধ

৩। জৈন

আস্তিক সম্প্রদায় ছয় ভাগে বিভক্তঃ

১। সাংখ্য

২। যোগ

৩। ন্যায়

৪। বৈশেষিক

৫। পূর্ব-মীমাংসা বা মীমাংসা

৬। উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত

এখানে আস্তিক মানে বেদ-বিশ্বাসী, নাস্তিক মানে বেদ-বিরোধী। ঈশ্বরে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস প্রাসঙ্গিকই নয়। যাঁরা ঈশ্বর মানেন না তাঁরা যদি নাস্তিক হতেন, তবে মীমাংসকাচার্য ও সাংখ্যাচার্য নাস্তিক বলে অভিহিত হতেন। তাঁরা ঈশ্বর মানেন না। ঈশ্বর নেই- ইহা প্রচলিত সাংখ্য-দর্শনে যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। যাঁরা ঈশ্বর মানেন না, গীতাতে ভগবান তাঁদেরকে অসুর-সম্পদ-যুক্ত বলে নির্দেশ করেছেন, নাস্তিক বলেননি। মীমাংসকাচার্য ও সাংখ্যাচার্য ঈশ্বর মানেননা, কিন্তু বেদের অনুসারী। তাই তাঁরা নাস্তিক নন, অতিশয় আস্তিক। অপরদিকে, চার্বাক দর্শনে, বৌদ্ধদর্শনে বেদের প্রমান অঙ্গীকৃত হয়নি বলে তারা নাস্তিক।

ইসলাম ধর্মের আলোকে আস্তিক ও নাস্তিকের ব্যাখ্যাঃ

ইসলামে আস্তিক শব্দের ব্যাখ্যা হচ্ছে- মু'মিন বা ঈমানদার। এই ঈমান হলো সর্বশক্তিমান আল্লাহতে বিশ্বাস। আল্লাহর রাসুল হিসাবে মুহাম্মাদ সা. এর উপরও বিশ্বাস (কালেমা তাইয়েবা)।

"মুমিন তো তারাই যারা প্রতিফল দিবস কে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং তাদের পালনকর্তার শাস্তি সম্পর্কে ভীত প্রকম্পিত। নিশ্চয়ই তাদের পালনকর্তার শাস্তি সম্পর্কে নি:শংক থাকা যায় না।"[সূরা আল মাআরিজ (৭০):২৬-২৮]

"তারা তাদের পালনকর্তা কে ডাকে ভয় ও আশা সহকারে। " [সূরা সাজদাহ,(৩২:৪৬)]

এ প্রসংগে নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,মুমিনের হৃদয় যখন ভয় ও আশায় পরিপূর্ণ হয়ে যায় আল্লাহ তখন তার আশা পূরণ করেন। এবং সে যার ভয় করে তা থেকে তাকে রক্ষা করেন। (ইবনে মাজাহ)

আর নাস্তিক শব্দের ব্যাখ্যা হচ্ছে-

১। কুফর

২। শিরক

৩। মোনাফেকি

নাস্তিক শব্দের সবচেয়ে কাছের শব্দটি হলো কুফর। কুফর শব্দটি সাধারণভাবে ঈশ্বরকে নির্দেশ করে না। সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি অনাস্থা/অবিশ্বাস/অংশীদ্বারকে নির্দেশ করে। 'কুফর' হচ্ছে আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় হিসাবে অস্বীকার করা। এ ক্ষেত্রে আল্লাহকে অস্বীকার করে অন্য কোন ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করলেও সে কাফির। শিরক হচ্ছে অংশীদার করা- অর্থাৎ আল্লাহর গুনসমূহে অন্য কাউকে অংশীদার করলে তা হয় শিরক। এ বিশ্লেষণে পৌত্তলিকতা বা মূর্তি-পূজা শিরক। এই শিরককে কিন্তু ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ হিসাবে ইসলাম ধর্মে গণ্য করা হয়েছে। অপরদিকে 'মোনাফেকি'ও আল্লাহকে অবিশ্বাস- কিন্তু এটা হলো তাদের ক্ষেত্রে যারা মুখে বা উপরে-উপরে বিশ্বাস প্রদর্শন করে কিন্তু অন্তরে অবিশ্বাস ধারণ করে। প্রচলিত অর্থে শব্দটিকে বিশ্লেষণ করা যাক। ধর্ম পালনকারীদের সাধারণভাবে নাস্তিক বলা হয় না। (ধর্মে ঈশ্বরকে অস্বীকার করা হলেও) অনেক সময়ই পৈত্রিক ধর্মকে অস্বীকারকারীকে নাস্তিক বলা হয়। একজন মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী কেউ হিন্দুধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুললে বা হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণকারী একজন ইসলামধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন তুললে, তাকে হয়তো নাস্তিক বলা হয় না। যখন কেউ তার পৈত্রিক ধর্মের বিভিন্ন বিশ্বাস নিয়ে ক্রমাগত প্রশ্ন তুলতে থাকে এবং নতুন কোন ধর্মে নিজেকে সমর্পিতও না করে- তখন তাকে কখনও কখনও নাস্তিক বলে অভিহিত করা হয়। এখন যদি কেউ বলে- সে প্রচলিত কোন ধর্মের অনুশাসন মানে না, বিশ্বাসও করে না, কিন্তু সে জগত-সংসারের সৃষ্টিকর্তা একজন কেউ আছে বলে বিশ্বাস করে- তবে তাকে কি বলে আখ্যায়িত করা হবে? আস্তিক না নাস্তিক?

পর্যালোচনাঃ

প্রশ্নের উত্তরে কেউ বলেছেন- "তাকে নাস্তিক বলতে হবে"কেউ বলেছেন "আস্তিক "আবার কেউ বলেছেন সংশয়বাদী। সংশয়বাদ নিয়ে অনেকে গঠনমূলক আলোচনাও করেছেন। সংশয়বাদীদের পক্ষে একালের দার্শনিকদের মধ্যে বার্ট্রান্ড রাসেলের কথা সর্বাগ্রে আসে। তাঁর 'দি প্রব্লেমস অব ফিলসফি' গ্রন্থ আরম্ভই করেছেন এভাবে, "এমন কোন সুনিশ্চিত জ্ঞান কি আছে যাকে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও সন্দেহ করবে না?"

দর্শনের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "সাধারণ চোখে যাকে জ্ঞান বলে মনে হয়, তার সম্বন্ধে আমাদের মনে সংশয় জাগে এবং এ সংশয়ের উত্তর পাওয়া যেতে পারে কেবল এক বিশেষ ধরণের অনুসন্ধানের ভাবনায়। এ অনুসন্ধানের আমরা নাম দেই দর্শন"। এতো গেল হালের দার্শনিকের কথা। সে আমলে সংশয়বাদী দার্শনিকের কথাও একটু আলোচনা করা যাক। গ্রীক দার্শনিক পাইরো বলেন, "আমরা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ দ্বারা বস্তুর বৈশিষ্ট নয়, এর বাহ্যিক রূপটাকেই শুধু জানতে পারি"। তাঁর মতে, "হয়তো কোন যুক্তির বিপরীত আরও মজবুত প্রামান্য যুক্তি পাওয়াও সম্ভব"। "কোন বস্তুর সংজ্ঞা নির্ণয় করতে হলে প্রমান দরকার- যা কিনা নিস্ফল তর্ক; আবার তাকে খন্ডানোর জন্য নতুন প্রমান চাই"। এই পাইরো কিন্তু সেকালের স্টোয়িকদের ঈশ্বরবাদকে ক্রমাগত যুক্তি দিয়ে খন্ডন করে গেছেন। সে সময়ে আমাদের দেশের নাগার্জুনও কিন্তু পাইরোর অনুরূপ মত ধারণ করতেন।

ভারতীয় দর্শন

এবার তাহলে আমাদের ভারতীয় দর্শনের দিকে একটু তাকাই। অনেকান্তবাদ ও স্যাদবাদ- খুবই চিত্তাকর্ষক ও মজার এই মতকে কি বলবেন? নিরীশ্বরবাদী জৈনধর্মের আধার হলো স্যাদবাদ। তা কিন্তু আবার এসেছে সঞ্জয় বেলঢিপ্পুত্বের অনেকান্তবাদের হাত ধরে। সঞ্জয় পরলোক, দেবতা প্রভৃতি তত্বের নিশ্চয়াত্মক রূপে কিছু বলতে অস্বীকার করেন এবং সেই অস্বীকারকেও চার স্তরে বিভক্ত করেছেন-

১। আছে? – বলা যায় না।

২। নেই? – বলা যায় না।

৩। আছেও আবার নেইও? – বলা যায় না।

৪। আছে নেই আবার নাও নেই? বলা যায় না।

এই চারের সাথে আরও তিন যুক্ত করে জৈনধর্মের সপ্তরূপ তথা তাদের স্যাদবাদঃ

১। আছে? – হতে পারে(স্যাদ আস্তি)।

২। নেই? – নাও হতে পারে(নাস্তি)।

৩। আছেও আবার নেইও? – হতেও পারে নাও পারে।

প্রাচীন ভারতের "আস্তিক" "নাস্তিক" সংজ্ঞা অন্য রকম। পরলোক তত্ত্বে বিশ্বাসীদের আস্তিক আর অবিশ্বাসীদের নাস্তিক বলা হত। পাণিনি রচিত 'অষ্টাধ্যায়ী'র নাম সবারই জানা। প্রাচীন ভারতীয় ব্যাকরণের সুবিখ্যাত নির্ভুল গ্রন্থ। পাণিনি ব্যাকরণসূত্রে আমরা জানতে পারি 'অস্তিনাস্তিদিষ্টং মতি:(৪/৪/৬০)। অর্থাৎ পরলোক আছে ধারণায় প্রভাবিত ব্যক্তিকে আস্তিক (দিষ্টং পরলোকো অস্তি) এবং 'দিষ্টং পরলোকো নাস্তি' অর্থাৎ পরলোক নেই ধারণায় প্রভাবিত ব্যক্তিকে নাস্তিক বলা হয়েছে। (অস্তিগতিরস্য=আস্তিকঃ পরলোকোঽস্তি ইতি যস্য গতিরস্তি স আস্তিকঃ) পাণিনি সূত্রের ব্যাখ্যাকার ব্যাকরণবিদ্ মহর্ষি পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' গ্রন্থের মতানুসারে 'অস্তি' (আছে) ধারণার বশবর্তী ব্যক্তিগণ আস্তিক এবং 'ন অস্তি' (নেই) ধারণায় বশবর্তী ব্যক্তিগণ নাস্তিক পদের দ্বারা অভিধেয় (মহাভাষ্য ৪/৪/১)।

মনুসংহিতায় পাই –

অনপেক্ষিতমর্যাদং নাস্তিকং বিপ্রলুম্পকম্।

অরক্ষিতারমত্তারং নৃপং বিদ্যাদধোগতিম্।।(মনুসংহিতা ৮/৩০৯)

মনুসংহিতার টীকাকার মেধাতিথির শ্লোকে উল্লেখ আছে 'নাস্তিক' শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন "পরলোক বলে কিছু নেই, যাগ-দান-হোম এগুলিও কিছু নয়- এইরকম কথা যিনি বলেন এবং এই বিশ্বাসে যিনি চলেন তিনি নাস্তিক।"

জৈনদের ধারণা প্রাচীন ভারতীয়দের মতই। জৈনদার্শনিক হরিভদ্র সূরীর 'ষড়্দর্শনসমুচ্চয়' গ্রন্থে 'আস্তিকবাদিনাম্' সূত্রের দেখা পাই। টীকাকার সোমতিলক সূরীর মতে পদটির অর্থ হল- 'পরলোকগতিপুণ্যপাপাস্তিক্যবাদিনাম্'। অর্থাৎ আস্তিকবাদী বলতে তাঁদেরকেই বোঝায় যাঁদের পরলোক, পুণ্য, পাপ ইত্যাদিতে আস্থা আছে।

অতএব যে কোন নিরীশ্বরবাদীকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। বেদে বিশ্বাসী এবং বেদে অবিশ্বাসী। সুতরাং খুঁটিয়ে বিচার করলে ভারতীয় ষড়্ দর্শন অনুযায়ী সেমেটিকিয়

মূল্যবোধে (eschatology) ইংরাজী Atheism শব্দটির ভাষান্তর “নিরীশ্বরবাদ” সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে না। মনে হয় ইংরাজী এথিস্ট শব্দটির সঠিক বাঙ্গালা ভাষান্তর বা অর্থ হওয়া উচিত “বেদে অবিশ্বাসী নিরীশ্বরবাদী”।

নাস্তিকগণ ছ’টি শ্রেণীতে বিভক্ত। ১. মাধ্যমিক, ২. যোগাচার, ৩. সৌত্রান্তিক, ৪. বৈভাষিক, ৫. চার্বাক ও ৬. দিগম্বর। স্বল্প পরিসরে বিভিন্ন শ্রেণীর পার্থক্য বোঝানো অসম্ভব।

ভারতীয় ষড়্ দর্শন যারা একটু পড়ার চেষ্টা করেছেন বা ভাল ভাবে পড়েছেন তাঁরা জানেন কি ভাবে নাস্তিকত্বর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করা হয়েছে।

ভারতীয় ষড়্ দর্শন অনুযায়ী নিজেকে নাস্তিক পরিচয় দিলে তার নাস্তিকত্বর সঠিক পরিচয় বা নাস্তিকত্বর শ্রেণী বিভাগ দিয়ে বোঝাতে হবে।

আমরা তা হলে “আস্তিক” এবং “নাস্তিক” শব্দদুটির সংজ্ঞা তিনটি পেলাম।

১। পরলোক তত্ত্বে বিশ্বাসীরা আস্তিক আর অবিশ্বাসীরা নাস্তিক।

২। বেদে বিশ্বাসীগণ আস্তিক আর অবিশ্বাসীগণ নাস্তিক।

৩। যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন তাঁরা “আস্তিক” এবং যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না তাঁরা “নাস্তিক”।

ভারতীয় দর্শনমতে যারা বেদ, ঈশ্বর ও আত্মার প্রতি বিশ্বাস রাখে তারা "আস্তিক", বিপরীত হলো "নাস্তিক"

আরিফ আজাদ,(২০১৯),**প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ,** গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স - নাস্তিকদের সম্পর্কে লিখিত অন্যতম জনপ্রিয় বই। বইটিতে অধ্যায়ন করে নাস্তিকদের আবিষ্কার করা ও তাদের দেওয়ার পদ্ধতি জানা যায়।

সত্যকথন(১-৩০০পর্ব) বইয়ে নাস্তিক ও ইসলাম বিদ্বেষীদের বিভ্রান্তির জবাব দেওয়া হয়েছে

চতুর্থ অধ্যায় : নাস্তিকতার স্বরূপ

নাস্তিকতার প্রকার:

[নাস্তিক বিশ্বাসের মৌলিক শ্রেণী তিনটি। যথা-

(1) ইস্যুতে কোনো অবস্থান না নিয়েই দেবতার প্রতি অবিশ্বাস;

(2) অজ্ঞেয়বাদী-নাস্তিকতা, কিছু মাত্রায় অবিশ্বাস প্রকাশ করা কিন্তু জ্ঞানের দাবি ছাড়াই (সন্দেহবাদ); এবং

(3) জ্ঞানবাদী-নাস্তিকতা, দৃঢ়ভাবে একটি দেবতার অস্তিত্বকে প্রত্যাখ্যান করে ...

Gnostic-Atheism: Any explicit or implied characterization of the participant's position as certain or definite.

Agnostic-Atheism: Any effort made to distinguish between a "belief" and "knowledge" position; or participants who indicate that they are open to evidence: they describe their belief as malleable and open to changing based on new information, evidence, or "proof."

Ambivalent-Atheism: Any use of the phrase "I don't know" or "I am not sure," or similar characterizations of belief, without further explanation.

gnostic-atheism, firmly rejecting the existence of a deity and claiming to have knowledge or proof that no deity exists (ddogmatism).]

নাস্তিকতা বনাম ধর্ম: কেস স্টাডি (আমেরিকা)

আঠারো শতকের পূর্বে ঈশ্বরের অস্তিত্ব পশ্চিমা সমাজে এতটাই স্বীকৃত ছিল যে, এমন কি প্রকৃত নাস্তিকতাই সেখানে প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। এ বিষয়টিকে বলা হত জন্মগত বিশ্বাসী। এর মানে হলো মানুষ জন্মগত ভাবেই ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং নাস্তিকতা সেখানে সহজাতভাবেই প্রত্যাখাত একটি বিষয় ছিল।

সাধারণ মানুষের একপক্ষ আবার নাস্তিকদের নিয়ে একটি বিশেষ ধারণা পোষণ করতো। তাদের দাবী অনুসারে একজন নাস্তিক তীব্র বিপদের সময় হঠাৎই ঈশ্বরে বিশ্বাস নিয়ে আসে, তারা মৃত্যু কালীন সময়ে ধর্মান্তরিত হয় এবং চরম বিপদ যেমনঃ দুর্যোগ বা "যুদ্ধকালীন সময়ে কোনো নাস্তিকই নাস্তিক থাকে না"। পক্ষান্তরে তীব্র দুর্যোগের মুহুর্তেও যে মানুষ নাস্তিক থাকতে পারে, এরূপ উদাহরণও আছে।

কিছু নাস্তিক নাস্তিকতাবাদের খুব বেশি প্রয়োজন আছে কিনা তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। স্যাম হ্যারিস তার বই লেটার টু অ্যা ক্রিশ্চিয়ান নেশনে লিখেন:

প্রকৃতপক্ষে, "নাস্তিকতাবাদ" হচ্ছে এমন একটি পদবাচ্য, যার অস্তিত্বই থাকা উচিত না। কেওই নিজেকে "আমি জ্যোতিষ নই" বা "আমি আলকেমিস্ট নই" এই মর্মে অভিহিত করেন না। যেসব ব্যক্তি সন্দেহ করে এলভিস [একজন আমেরিকান সংগীত শিল্পী] এখনো জীবিত থাকতে পারে অথবা এলিয়েনরা হাতের ছোয়ায় এই মহাবিশ্বকে তাদের গোয়ালের প্রাণী বানিয়ে রাখবে, তাদের জন্য শব্দ খরচ করার মত শব্দ আমাদের নেই। যে ধর্মের সত্যতা নির্ধারণ করা যায় না, এজাতীয় ধর্মের বিপরীতে যুক্তিবাদী ব্যক্তির যে কোনো শব্দই নাস্তিক্যবাদের প্রতিনিধিত্ব করে। স্বতন্ত্রভাবে নাস্তিক্যবাদ শব্দটির আমদানী অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার মাত্র।"

প্যালেস্টাইনে ৩ থেকে ৭ শতাংশ নাস্তিক আছে। এই দেশগুলোর মানুষকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, তারা তাদের স্থানীয় এলাকায় নাস্তিক শব্দটি শুনেছে কিনা, সেখানের শুধুমাত্র ৩ থেকে ৮ শতাংশ মানুষ জানায় তারা শুনেছে। একমাত্র আরব আমিরাত ব্যতিক্রম সেখানের ৫১ শতাংশ মানুষ শুনেছে।

সম্পদ এবং শিক্ষা এর সাথে নাস্তিকতার আন্তঃসম্পর্ক

“,একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে আমেরিকায় সেক্যুলারিজম এবং নাস্তিক্যবাদের স্তরের সাথে শিক্ষার একটি ইতিবাচক আন্তঃসম্পর্ক জড়িত আছে।[৯৩] বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানী নিগেল বারবার মনে করেন, যেসব স্থানের মানুষ নিজেদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী মনে করছেন নাস্তিক্যবাদের স্ফুরণ সেখানেই ঘটেছে। যেসব স্থানে মানুষ তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তিত নয়, স্বাস্থ্য সুবিধা পর্যাপ্তভাবে পায়, দীর্ঘায়ু হন সেখানেই নাস্তিকতার উর্ধ্বগতি হয়। বিপরীতক্রমে উন্নয়নশীল দেশে নাস্তিকতার হার ক্রমহ্রাসমান হয়।

২০০৮ সালের গবেষণামতে গবেষকরা দেখেছেন, ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্রে বুদ্ধিমত্তার সাথে ধর্মীয় বিশ্বাসের নেতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। ১৩৭ দেশের স্যাম্পলে জাতীয় আইকিউ আর অবিশ্বাস এর আন্তঃসম্পর্ক ০.৬।বিবর্তনীয় মনস্তাত্ত্বিক নিগেল বারবার উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে বলেন, নাস্তিকদের বেশি বুদ্ধিমান হওয়ার জন্য সামাজিক, পরিবেশগত শিক্ষা এবং সম্পদ সংক্রান্ত ফ্যাক্টর দিয়ে ভালভাবে ব্যাখ্যা করা যায় এবং এসব কিছুই ধর্মীয় বিশ্বাস হ্রাসের সাথে আন্তঃসম্পর্কিত। ধর্ম বেকুবি তৈরি করে; এবিষয়ে তিনি সন্দিহান। তার কারণ অনেক মানুষ আছেন যারা যথেষ্ট বুদ্ধিমান হওয়া সত্বেও ধার্মিক। কিন্তু একইসাথে তিনি বলেছেন এটাও সম্ভব হতে পারে ধর্মবিশ্বাস প্রত্যাখানের সাথে উচ্চমাত্রার বুদ্ধিমত্তা একটি সম্পর্ক আছে এবং বুদ্ধিমত্তা এবং ধর্মীয় বিশ্বাস প্রত্যাখানের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক বেশ জটিল।

২০১৭ সালের গবেষণা মতে, ধার্মিক এবং নাস্তিক এর মধ্যকার তুলনা করলে দেখা যায় নাস্তিকদের বোঝার সক্ষমতাটা অনেক বেশি এর মধ্যকার পার্থক্য বয়স, শিক্ষা, এবং কোন দেশের সেই সামাজিকপরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করেনা অর্থাৎ সমস্ত দেশ বা স্থানে নাস্তিকদের বুঝার সক্ষমতা সর্বোচ্চ থাকে।”

নাস্তিকদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী

নাস্তিকদের প্রতি **ধর্ম অবমাননা আইন বিশিষ্ট দেশসমূহ**

বাতিল করা হয়েছে

স্থানীয় বিধিনিষেধ

জরিমানা এবং বিধিনিষেধ

কারাদন্ড

মৃত্যুদন্ড



ধর্মত্যাগের জন্য মৃত্যুদণ্ড প্রদানকারী দেশসমূহ

পারিসংখ্যানিক ভাবে বিশ্বাস করা হয়, নাস্তিকরা মানসিকভাবে হীন দরিদ্র হয়ে থাকে। বিশ্বাসীরা তো বটেই, এমনকি কিছু নাস্তিক মনে করে, নাস্তিকরা অসৎ চরিত্রের হয়ে থাকে। এই অসৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কিরূপ হতে পারে, তার বর্ণনার মধ্যে রয়েছে খুন করা থেকে শুরু করে রেস্তোরায় খাবারের বিল পরিশোধ না করা।২০১৬ সালে পিউ রিসার্চ সেন্টারের একটি প্রকাশনা মধ্যে দেখা গিয়েছে যে ফরাসি মানুষদের ১৫%, ৪৫ শতাংশ আমেরিকান এবং ৯৯% ইন্দোনেশীয় বিশ্বাস করে সৎ চরিত্রের অধিকারী হতে হলে অবশ্যই ঈশ্বরে বিশ্বাস করা প্রয়োজনীয়।

নাস্তিকরা কী ইসলাম বিদ্বেষী হয়:

“নাস্তিকরা সাধারণত যে দেশে বসবাস করে সে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠদের ধর্মের সমালোচনা বেশি করে থাকে। কারণ সেই দেশের সমাজ ব্যাবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠদের ধর্মের প্রভাব বেশি থাকে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সেটা ইসলাম। ভারতের ক্ষেত্রে সেটা সনাতন ধর্ম। আমেরিকার ক্ষেত্রে সেটা খ্রিষ্ট ধর্ম।

মজার ব্যাপার হলো, প্রত্যেকটি দেশে যে ধর্ম সংখ্যগরিষ্ঠ সেই ধর্মের অনুসারীরা সেই দেশের নাস্তিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে তাদের দেশের নাস্তিকরা শুধু তাদের ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা এবং সমালোচনা করে। ভারতের হিন্দুরাও সেই দেশের নাস্তিক, বামপন্থী এবং স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, তারা শুধু হিন্দু নিয়েই ব্যাঙ্গ করে। কিন্তু ইসলাম ধর্ম নিয়ে ব্যাঙ্গ করে না। আবার অমেরিকার খ্রিস্টানরাও সেই দেশের নাস্তিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে নাস্তিকরা শুধু খ্রিস্ট ধর্ম নিয়েই ব্যাঙ্গ করে। আর কোন ধর্ম তারা খুঁজে পায় না।

আপনি কিছু ভারতীয় নাস্তিক অথবা আমেরিকার নাস্তিকদের ফেসবুক পেজ অথবা গ্রুপে গিয়ে চেক করুন। দেখবেন ভারতের নাস্তিকরা হিন্দু ধর্ম এবং আমেরিকার নাস্তিকরা খ্রিষ্ট ধর্মের সমালোচনা বেশি করছে।”

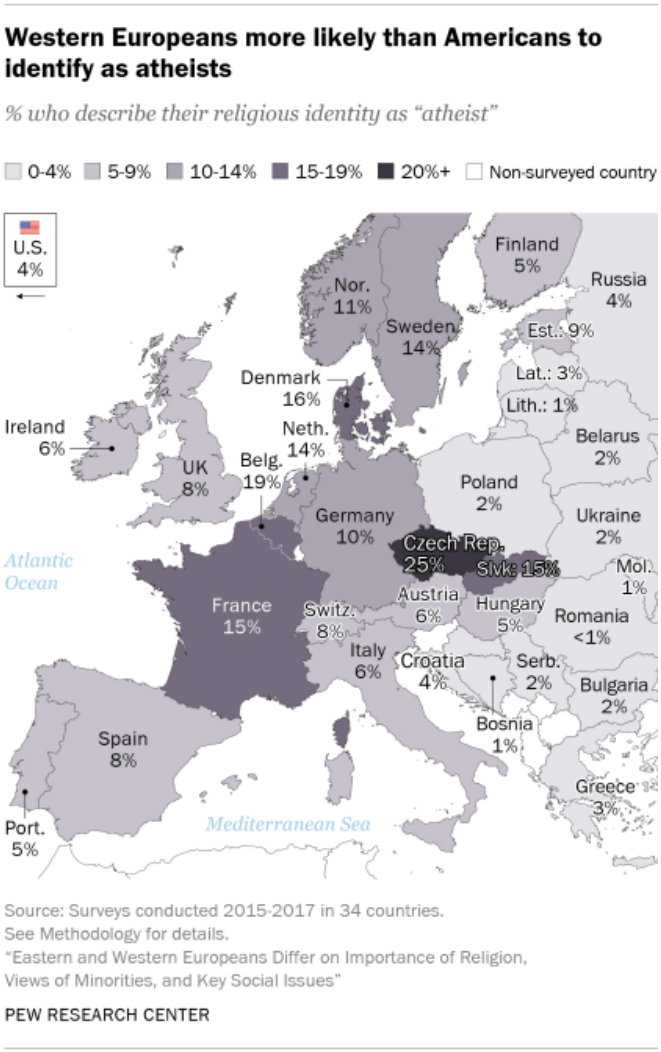
নাস্তিকতার পরিমাপক: কেস স্টাডি (আমেরিকা)

“নাস্তিকতা পরিমাপ করা জটিল। কিছু লোক যারা নিজেদেরকে নাস্তিক বলে বর্ণনা করে তারাও বলে যে তারা কোন প্রকার উচ্চ শক্তি বা আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাস করে। একই সময়ে, কিছু যারা একটি ধর্মের সাথে পরিচয় দেয় (উদাহরণস্বরূপ, তারা ক্যাথলিক বা ইহুদি) বলে তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না।

একটি বিষয় নিশ্চিত: ধর্মীয়ভাবে অসংলগ্ন আমেরিকানদের উত্থানের সাথে সাথে - যাদের মধ্যে অনেকেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করে - সেখানে নাস্তিকদের সংখ্যা একইভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সারা বিশ্বের নাস্তিকদের সম্পর্কে কিছু মূল তথ্য রয়েছে:

1। **নাস্তিক হিসেবে চিহ্নিত আমেরিকানদের ভাগ গত এক দশকে সামান্য হলেও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে** । 2018 এবং 2019 সালে পরিচালিত পিউ রিসার্চ সেন্টার টেলিফোন সমীক্ষা দেখায় যে 4% আমেরিকান প্রাপ্তবয়স্করা বলে যে তারা নাস্তিক বলে তাদের ধর্মীয় পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, যা 2009 সালে 2% থেকে বেশি। অতিরিক্ত 5% আমেরিকানরা নিজেদেরকে অজ্ঞেয়বাদী বলে, 3% থেকে দশক আগে

2 মেরিয়াম-ওয়েবস্টারের মতে "নাস্তিক" এর আক্ষরিক সংজ্ঞা হল "একজন ব্যক্তি যে ঈশ্বর বা কোনো দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না" । এবং মার্কিন নাস্তিকদের সিংহভাগই এই বর্ণনার সাথে মানানসই: 81% বলে যে তারা ঈশ্বর বা উচ্চতর শক্তিতে বা কোনো ধরনের আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাস করে না। (সামগ্রিকভাবে, আমেরিকান প্রাপ্তবয়স্কদের 10% এই মতটি ভাগ করে।) একই সময়ে, **প্রায় পাঁচজনের মধ্যে একজন স্ব-বর্ণিত নাস্তিক (18%) বলে যে তারা কোন ধরণের উচ্চ শক্তিতে বিশ্বাস করে** । যদিও আমরা সমীক্ষা করেছি নাস্তিকদের কেউই বলে না যে তারা "বাইবেলে বর্ণিত ঈশ্বরে" বিশ্বাস করে।

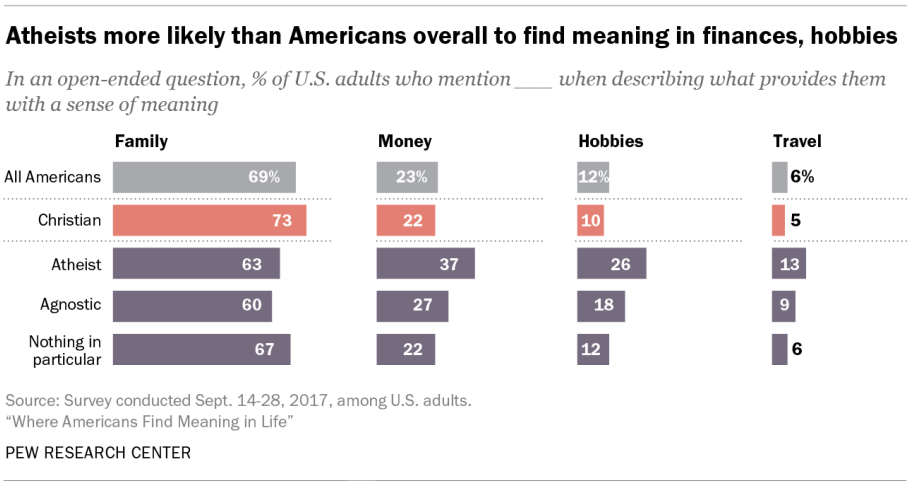


3 নাস্তিকরা আমেরিকার তুলনায় অনেক ইউরোপীয় দেশে জনসংখ্যার একটি বড় অংশ তৈরি করে পশ্চিম ইউরোপে, যেখানে পিউ রিসার্চ সেন্টার 2017 সালে 15টি দেশে জরিপ করেছে , প্রায় পাঁচজনের মধ্যে এক বেলজিয়ান (19%) নাস্তিক হিসাবে চিহ্নিত ডেনমার্কে 16%, ফ্রান্সে 15% এবং নেদারল্যান্ডস এবং সুইডেনে 14%। তবে নাস্তিকদের সবচেয়ে বড় অংশের সাথে ইউরোপীয় দেশ হল চেক প্রজাতন্ত্র , যেখানে এক চতুর্থাংশ প্রাপ্তবয়স্করা এইভাবে চিহ্নিত করে। প্রতিবেশী স্লোভাকিয়ায়, 15% নাস্তিক হিসাবে চিহ্নিত, যদিও মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের বাকি অংশে, আনুষ্ঠানিকভাবে নাস্তিক সোভিয়েত ইউনিয়নের ঐতিহাসিক প্রভাব থাকা সত্ত্বেও নাস্তিকদের উপস্থিতি কম। আমেরিকানদের মতো, অনেক দেশের ইউরোপীয়রা নাস্তিক হিসাবে চিহ্নিত করার চেয়ে তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না বলার সম্ভাবনা বেশি, যার মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ চেক এবং অন্তত অর্ধেক

সুইডিশ (60%), বেলজিয়ান (54%) এবং ডাচ। প্রাপ্তবয়স্ক (53%) যারা বলে যে তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। লাতিন আমেরিকা এবং সাব-সাহারান আফ্রিকা সহ কেন্দ্র দ্বারা জরিপ করা অন্যান্য অঞ্চলে , নাস্তিকরা সাধারণত অনেক বিরল।

4 2014 সালের ধর্মীয় ল্যান্ডস্কেপ স্টাডি অনুসারে **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, নাস্তিকরা বেশিরভাগই পুরুষ এবং তুলনামূলকভাবে তরুণ** । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দশজনের মধ্যে প্রায় সাতজন নাস্তিক পুরুষ (68%)। নাস্তিকদের গড় বয়স 34, সমস্ত মার্কিন প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য 46 এর তুলনায়। নাস্তিকদেরও শ্বেতাঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি (সাধারণ জনগণের 78% বনাম 66%) এবং উচ্চ শিক্ষিত: দশজনের মধ্যে প্রায় চারজন নাস্তিকের (43%) কলেজ ডিগ্রি রয়েছে, সাধারণ জনগণের 27% এর তুলনায়। স্ব-পরিচিত নাস্তিকরাও ডেমোক্রেটিক পার্টি এবং রাজনৈতিক উদারনীতির সাথে একত্রিত হতে থাকে ।

5 মার্কিন নাস্তিকদের সিংহভাগই বলে যে ধর্ম তাদের জীবনে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় বা একেবারেই গুরুত্বপূর্ণ নয় (93%) এবং তারা খুব কমই বা কখনও প্রার্থনা করে না (97%)। একই সময়ে, অনেকে নাস্তিকতা এবং পৃথিবীতে তাদের অবস্থান নিয়ে চিন্তা করার মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব দেখতে পান না। আমেরিকান নাস্তিকদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ বলে যে তারা জীবনের অর্থ এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে অন্তত সাপ্তাহিক (35%) চিন্তা করে এবং তারা প্রায়ই আধ্যাত্মিক শান্তি এবং সুস্থতার গভীর অনুভূতি অনুভব করে (31%)। প্রকৃতপক্ষে, রিলিজিয়াস ল্যান্ডস্কেপ স্টাডি দেখায় যে **মার্কিন খ্রিস্টানদের তুলনায় নাস্তিকরা বেশি বলে যে তারা প্রায়শই মহাবিশ্ব সম্পর্কে বিস্ময়ের অনুভূতি অনুভব করে** (54% বনাম 45%) ।



6 নাস্তিকরা জীবনের অর্থ কোথায় পায়? 2017 সালের একটি সমীক্ষায় পিউ রিসার্চ সেন্টার যখন এই বিষয়ে একটি ওপেন-এন্ডেড প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল তখন বেশিরভাগ আমেরিকানদের মতো, বেশিরভাগ নাস্তিকরা "পরিবার" অর্থের উৎস হিসাবে উল্লেখ করেছে । কিন্তু **খ্রিস্টানদের তুলনায় নাস্তিকরা শখকে অর্থপূর্ণ বা সন্তোষজনক হিসাবে বর্ণনা করার সম্ভাবনা অনেক বেশি ছিল** (26% বনাম 10%)। অর্থ ও অর্থ, সৃজনশীল সাধনা, ভ্রমণ এবং অবসর ক্রিয়াকলাপকে অর্থপূর্ণ হিসাবে বর্ণনা করার সামগ্রিকভাবে আমেরিকানদের তুলনায় নাস্তিকদেরও বেশি সম্ভাবনা ছিল। আশ্চর্যের বিষয় নয়, খুব কম মার্কিন নাস্তিক (4%) বলেছেন যে তারা আধ্যাত্মিকতায় জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়েছেন।

7 অনেক ক্ষেত্রে, নাস্তিক হওয়া মানে শুধু ব্যক্তিগতভাবে ধর্মীয় লেবেল এবং বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করা নয় – **বেশিরভাগ নাস্তিক সমাজে ধর্মের ভূমিকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে নেতিবাচক মতামতও প্রকাশ করে** । উদাহরণস্বরূপ, দশজনের মধ্যে সাতজন মার্কিন নাস্তিক বলেছেন যে আমেরিকান জনজীবনে ধর্মের প্রভাব কমছে, এবং এটি একটি ভাল জিনিস (71%), 2019 সালের সমীক্ষা অনুসারে । সামগ্রিকভাবে মার্কিন প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে পাঁচজনের মধ্যে এক-এর কম (17%) এই মতামতটি ভাগ করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ নাস্তিক (70%) এও বলে যে গীর্জা এবং অন্যান্য ধর্মীয় সংগঠনগুলি সমাজে ভালোর চেয়ে বেশি ক্ষতি করে, এবং আরও বড় অংশ (93%) বলে যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি মার্কিন রাজনীতিতে খুব বেশি প্রভাব ফেলে।

৪। নাস্তিকরা ধর্মীয় শিক্ষা বিশ্বাস নাও করতে পারে, কিন্তু তারা ধর্ম সম্পর্কে বেশ সচেতন । পিউ রিসার্চ সেন্টারের 2019 সালের ধর্মীয় জ্ঞান সমীক্ষায় , নাস্তিকরা সেরা পারফরম্যান্সকারী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ছিল, 32টি সত্য-ভিত্তিক প্রশ্নের মধ্যে গড়ে প্রায় 18টির সঠিক উত্তর দিয়েছে, যখন মার্কিন প্রাপ্তবয়স্করা সামগ্রিকভাবে গড়ে প্রায় 14টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে। নাস্তিকরা খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কিত প্রশ্নে খ্রিস্টানদের মতো অন্তত জ্ঞানী ছিল - উভয় দলের মধ্যে প্রায় আট-দশজন, উদাহরণস্বরূপ, জানেন যে ইস্টার যীশুর পুনরুত্থানের স্মরণ করে - এবং তারা সামগ্রিকভাবে আমেরিকানদের চেয়ে দ্বিগুণ জানতে পেরেছিল যে মার্কিন সংবিধান বলেছে যে সরকারী পদে থাকার জন্য "কোন ধর্মীয় পরীক্ষা" প্রয়োজন হবে না।

9 2017 সালের সমীক্ষা অনুসারে, **বেশিরভাগ আমেরিকান (56%) বলেছেন যে নৈতিক হওয়ার জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাস করা প্রয়োজন নয়** , যেখানে 42% বলেছেন যে ভাল মূল্যবোধের জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাস করা প্রয়োজন । অন্যান্য ধনী দেশগুলিতে, ছোট শেয়ারগুলি বলে যে ভাল নৈতিকতার জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাস অপরিহার্য, ফ্রান্সে মাত্র 15% সহ। কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য অনেক জায়গায়, প্রায় সবাই বলে যে একজন ব্যক্তিকে নৈতিক হওয়ার জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে হবে, যার মধ্যে 99% ইন্দোনেশিয়া এবং ঘানায় এবং 98% পাকিস্তানে, 2013 সালের পিউ রিসার্চ সেন্টারের আন্তর্জাতিক সমীক্ষা অনুসারে ।

10 আমেরিকানরা বেশিরভাগ প্রধান ধর্মীয় গোষ্ঠীর সদস্যদের প্রতি নাস্তিকদের প্রতি কম উষ্ণতা অনুভব করে। একটি 2019 পিউ রিসার্চ সেন্টার সমীক্ষা আমেরিকানদের একটি "অনুভূতি থার্মোমিটারে" গ্রুপকে 0 (যতটা সম্ভব ঠান্ডা এবং নেতিবাচক) থেকে 100 (উষ্ণতম, সবচেয়ে ইতিবাচক সম্ভাব্য রেটিং) রেট দিতে বলেছে। মার্কিন প্রাপ্তবয়স্করা নাস্তিকদের গড়ে 49 রেটিং দিয়েছে, তারা যে রেটিং দিয়েছে মুসলমানদের (49) সমান এবং ইহুদিদের (63), ক্যাথলিক (60) এবং ধর্মপ্রচারক খ্রিস্টানদের (56) দেওয়া গড় তুলনায় ঠান্ডা।]"

নাস্তিকতার জনসংখ্যা:

নাস্তিকতার সঠিক জনসংখ্যা পাওয়া কঠিন কারণ নাস্তিকতার ধারণা বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং ভাষা জুড়ে যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়, একটি সক্রিয় ধারণা থেকে গুরুত্বহীন বা বিকশিত না হওয়া পর্যন্ত। এছাড়াও কিছু দেশ এবং অঞ্চলে নাস্তিকতা একটি শক্তিশালী কলঙ্ক বহন করে, যা এই দেশে নাস্তিকদের গণনা করা কঠিন করে তোলে। বৈশ্বিক গবেষণায়, কোনো ধর্ম ছাড়া মানুষের সংখ্যা সাধারণত কোনো দেবতায় বিশ্বাস না করা মানুষের সংখ্যার চেয়ে বেশি এবং বিশ্বাসের অভাবের বিষয়ে বিবৃতিতে একমত লোকের সংখ্যা একটি দেবতার মধ্যে সাধারণত "নাস্তিক" হিসাবে আত্ম-পরিচয়কারী লোকের সংখ্যা বেশি। সমাজবিজ্ঞানী ফিল জুকারম্যানের মতে, বিশ্বব্যাপী 500 থেকে 750 মিলিয়ন লোকের মধ্যে যাদের দেবতার প্রতি বিশ্বাস নেই তাদের বিস্তৃত অনুমান। অন্যান্য অনুমানে বলা হয়েছে যে বিশ্বব্যাপী 200 মিলিয়ন থেকে 240 মিলিয়ন স্ব-পরিচিত নাস্তিক রয়েছে, চীন এবং রাশিয়া এই পরিসংখ্যানগুলির প্রধান অবদানকারী। সমাজবিজ্ঞানী অ্যারিলা কিসার এবং জুহেম নাভারো-রিভেরার নাস্তিকতার উপর অসংখ্য বৈশ্বিক গবেষণার পর্যালোচনা অনুসারে, বিশ্বব্যাপী 450 থেকে 500 মিলিয়ন ইতিবাচক নাস্তিক এবং অজ্ঞেয়বাদী রয়েছে (বিশ্বের জনসংখ্যার 7%) শুধুমাত্র চীনের জনসংখ্যার 200 মিলিয়ন। নিজস্ব জনসংখ্যার তুলনায়, জুকারম্যান নাস্তিক এবং অজ্ঞেয়বাদীদের সর্বোচ্চ সম্ভাব্য রেঞ্জের সাথে শীর্ষ পাঁচটি দেশের তালিকায় রয়েছে: সুইডেন (46-85%), ভিয়েতনাম (81%), ডেনমার্ক (43-80%), নরওয়ে (31%) -72%), এবং জাপান (64-65%)।

বৈশ্বিক নাস্তিক এবং ধর্মহীন জনসংখ্যার মধ্যে, 76% এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরে বাস করে, বাকিরা ইউরোপে (12%), উত্তর আমেরিকা (5%), ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান (4%), সাব-সাহারানে বাস করে। আফ্রিকা (2%) এবং মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকা (1% এর কম)। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় নাস্তিকতার প্রসার সাধারণত ১০%-এর নিচে। পিউ রিসার্চ সেন্টারের 230টি দেশ ও অঞ্চলের 2012 সালের বৈশ্বিক সমীক্ষা অনুসারে , বিশ্বের জনসংখ্যার 16% একটি ধর্মের সাথে যুক্ত নয়, যেখানে 84%

অধিভুক্ত। অধিকন্তু, বৈশ্বিক গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে অনেক অসংলগ্ন, যার মধ্যে নাস্তিক এবং অজ্ঞেয়বাদী রয়েছে, তাদের এখনও বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশীলন রয়েছে।

নাস্তিক দর্শনের ঐতিহাসিক রেকর্ডগুলি কয়েক সহস্রাব্দে বিস্তৃত। নাস্তিক স্কুলগুলির প্রথম ঘটনাগুলি ভারতীয় চিন্তাধারায় পাওয়া যায় এবং প্রাচীন হিন্দুধর্মের সময় থেকে বিদ্যমান ছিল । পশ্চিমা নাস্তিকতার শিকড় রয়েছে প্রাক-সক্রেটিক গ্রীক দর্শনে , কিন্তু এনলাইটেনমেন্টের শেষের আগ পর্যন্ত ধর্মীয় দাবির ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে আবির্ভূত হয়নি ।

নাস্তিক এবং ধর্মীয় জনসংখ্যা কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে সে সম্পর্কে উৎসগুলির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অ-বিশ্বাসের মূল্যায়নের প্রশ্নগুলি ইতিবাচক নাস্তিকতার দাবির পরিবর্তে প্রচলিত বিশ্বাসের অস্বীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারে। এছাড়াও, স্ব-পরিচয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানুষের বিশ্বাসের অভাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। উদাহরণ স্বরূপ, ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকা, যে কারণেই হোক না কেন, স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই নয় যে মানুষ নিজেকে "নাস্তিক" হিসেবে পরিচয় দেয়। গ্লোবাল উইন-গ্যালাপ ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ অনুসারে , 2012 সালে উত্তরদাতাদের 13% "বিশ্বাসী নাস্তিক" ছিলেন, [18] 2015 সালে 11% "বিশ্বাসী নাস্তিক" ছিলেন, এবং 2017 সালে, 9% "বিশ্বাসী নাস্তিক" ছিলেন " যাইহোক, অন্যান্য পূর্ববর্তী বৈশ্বিক গবেষণাগুলি ইঙ্গিত করেছে যে বিশ্বব্যাপী ধর্মহীন দেশগুলির জন্মহার সর্বনিম্ন এবং ধর্মীয় দেশগুলিতে সাধারণভাবে উচ্চতর জন্মহারের কারণে বিশ্বব্যাপী নাস্তিকতা হ্রাস পেতে পারে।



নাস্তিক থেকে আস্তিক : কেস স্টাডি

১৯৭৭ সাল। ধর্ম যাজক ও টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক গ্যারি মিলার সিদ্ধান্ত নিলেন কোরআনের বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক ত্রুটি প্রকাশ করে নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবেন। এমন কিছু যুক্তি দাঁড় করাবেন, যার মাধ্যমে তিনি ও তাঁর মতো অন্য ধর্মযাজক মুসলিমদের খ্রিস্টবাদের প্রতি আহ্বান করতে পারেন। কিন্তু ফল হলো সম্পূর্ণ বিপরীত।

একসময় কোরআনের কাছেই আত্মসমর্পণ করলেন তিনি। গ্যারি মিলারের লেখা ছিল খুবই ন্যায়ানুগ এবং মন্তব্যগুলো ছিল ইতিবাচক। এমনকি কোরআন বিষয়ে বহু মুসলিমের তুলনায় তাঁর লেখা উন্নতমানের।

দীর্ঘ অনুসন্ধান ও গবেষণার পর তিনি বুঝতে পারেন কোরআন কোনো মানুষের সৃষ্ট নয়।

কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার বিষয়টি গ্যারি মিলারের জন্য ছিল প্রথম বিস্ময়। যেমন—পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তবে কি তারা কোরআন সম্পর্কে অনুধাবন করে না? এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে আসত, তবে তারা তাতে বহু অসংগতি খুঁজে পেত।' (সুরা নিসা, আয়াত : ৮২)

প্রফেসর মিলার কোরআন পাঠ শুরু করেছিলেন ত্রুটি-বিচ্যুতি খোঁজার জন্য। কিন্তু পরিণামে যা পেলেন তাতে যারপরনাই বিস্মিত হলেন।

মিলারের ভাষায় কোরআনের বিস্ময়কর কয়েকটি দিক হলো।

১. সাধারণত লেখক তার বই নির্ভুল বলে দাবি করে না। কিন্তু কোরআনে একাধিকবার আল্লাহ সমগ্র মানবজাতিকে বারবার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেছে কোরআন নির্ভুল।

২. কোরআনে মুহাম্মদ (সা.)-এর ব্যক্তিগত জীবন অনুল্লিখিত। যেমন খাদিজা (রা.), তাঁর কন্যা ও পুত্রদের মৃত্যুর ঘটনা।

বিশেষত কিছু পরাজয়ের মন্তব্যে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে এবং বিজয়ের সময় দম্ভ-অহংকারের পরিবর্তে আরো বেশি প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদি তা মুহাম্মদ (সা.)-এর রচিত হতো তবে তাতে তাঁর ব্যক্তি জীবন প্রাধান্য পেত এবং জয়-পরাজয়ের নানা কারণ বর্ণনা করতেন।

৩. কোরআন কোনো নির্ধারিত সময়ের ইতিহাস বর্ণনা করেনি। কিন্তু যুগে যুগে আল্লাহ ও মানুষের মধ্যকার সম্পর্কের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন, 'বলুন! আমি তোমাদের একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি—তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই-দুইজন অথবা একজন একজন করে দাঁড়াও। অতঃপর তোমরা চিন্তা করে দেখো—তোমাদের সঙ্গী অদৌ উন্মাদ নয়। সে তো কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র।' (সুরা সাবা, আয়াত : ৪৬)

এ আয়াতে আল্লাহ সম্মিলিত আলোচনার কথা বলেছেন। আর তিনি টরোন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সম্মিলিত আলোচনার প্রভাব ও ফলাফল সম্পর্কে' যে গবেষণা করেছিলেন তাতে তিনি প্রমাণ পেয়েছিলেন আলোচকের সংখ্যা বাড়লে তা বেশি কার্যকর ফল প্রদান করে।

৪. কোরআনে মারিয়াম (আ.)-এর নাম এসেছে। সেখানে এতটা সম্মানের সঙ্গে মারিয়াম (আ.)-এর আলোচনা করা হয়েছে, যা বাইবেলেও করা হয়নি। অন্যদিকে কোরআনে আয়েশা ও ফাতেমা (রা.)-এর নাম নেই। কোরআনে ঈসা (আ.)-এর নাম ২৫ বার এসেছে। অন্যদিকে মুহাম্মদ (সা.)-এর নাম এসেছে মাত্র পাঁচবার।

৫. মুহাম্মদ (সা.) ও আবু বকর (রা.) হেরা পর্বতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তখন পরিস্থিতি এমন ছিল যে সামান্য নড়াচড়া করলেই শত্রুরা তাদের দেখে ফেলবে। এমন পরিস্থিতিতে মানুষ সাধারণত পালানোর পথ খোঁজে। কিন্তু মুহাম্মদ (সা.) বললেন, 'ভয় পেয়ো না। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।' (সুরা তাওবা, আয়াত : ৪০)

কোনো প্রতারক এতটা আত্মবিশ্বাসী হয় না। অবশ্যই একজন সত্যবাদী নবীই এমন প্রতিকূলতার মধ্যে স্থির থাকতে পারেন, যিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন আল্লাহ অবশ্যই তাঁকে রক্ষা করবেন।

প্রফেসর মিলার সমকালীন ক্যাথলিক বিশ্বকোষ দেখেন। তাঁর মনে হয়, কোরআনের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ এখানে আনা হয়েছে তা যুক্তিতে টেকে না। চার্চ নিজেও এসব অভিযোগের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়নি, সাহস করেনি। আবার চিরন্তন সত্যও স্বীকার করেনি। কিন্তু আল্লাহ মিলারের প্রতি সদয় হোন এবং ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মুসলিম হয়ে আবদুল আহাদ ওমর নামধারণ করেন।

কুরআন অস্বীকার বা বিরোধিতাকারীদের কাছে আল্লাহর চ্যালেঞ্জ : কাফের, নাস্তিক বা

যারা কুরআনকে যেকোন ভাবে অস্বীকার করছেন তাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াতগুলোর মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করেছেন-

*আল্লাহ বলেন,, হে মানব সমাজ, এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকে সঙ্গে নাও-এক আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।

আর যদি তা না পার-অবশ্য তা তোমরা কখনও পারবে না, তাহলে সে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য।(সুরা বাকারাহ :২৩,২৪)

বলুনঃ যদি মানব ও জ্বিন এই কোরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্যে জড়ো হয়, এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না। (সুরা বনী-ইসরাঈল:৮৮)

এই আয়াতগুলোতে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে যে যদি পারেন কুরআনের মত মাত্র ছোট একটি সুরা রচনা করেন,,

আল্লাহ বলেন, এরা কি লক্ষ্য করে না কোরআনের প্রতি? পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হত, তবে এতো অবশ্যই বহু বৈপরিত্য দেখতে পেত। (সুরা নিসা:৮২)]

পঞ্চম অধ্যায়: উপাত্ত বিশ্লেষণ

৫.১ নাস্তিক ও ইসলাম বিদ্বেষীদের বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন ও জবাব

নাস্তিকরা (ইসলাম বিদ্বেষীরা) ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিভ্রান্তিমূলক প্রশ্ন করে। নিম্নে একটি মূল প্রশ্ন ও আনিষঙ্গিক কতিপয় প্রশ্নত্তোর উপস্থাপন করা হল-

মূল প্রশ্ন: স্রষ্টার কি অস্তিত্ব আছে?

উত্তর: আমরা তাঁর নিদর্শন দেখে, তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টি দেখে; আসমান, যমিন, পাহাড়-পর্বত দেখে এবং আমাদের নিকট যে অবিকৃত কুরআন আছে, এ-মুজিযা দেখে জানতে পারবাে যে, আল্লাহ আছেন। আর এসবকিছুই বলে দেয় যে, এক আল্লাহর অস্তিত্ব বিদ্যমান।

আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তাঁর মহাসত্তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন--

“আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ব্যাপারে কি তোমরা সন্দেহের মধ্যে রয়েছ?” (সূরা ইবরাহীম - ১০)

আল্লাহ তাআলা মহাজগতে তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণকারী নিদর্শনাবলির প্রতি নির্দেশ করে বলেছেন—

“আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রজনীর পরিবর্তনে অবশ্যই নিদর্শনাবলি রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্নদের জন্য। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও পার্শ্বশয়নে আল্লাহকে স্মরণ করে। আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করে ও বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করোনি। তুমি পবিত্র মহান। তুমি আমাদেরকে রক্ষা করো জাহান্নামের শাস্তি থেকে” (সূরা আলে ইমরান: ১৯০-১৯১)

বিশ্বাসীগণের বিবেকের কাছে এ প্রশ্ন রেখে কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে—

“আর বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে আমার নিদর্শনাবলি এবং স্বয়ং তোমাদের মাঝেও। সুতরাং তোমরা কি অনুধাবন করবে না? আকাশে বরাদ্দ করে রাখা হয়েছে তোমাদের জীবনোপকরণ ও তোমাদেরকে যা কিছুর প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।” (সূরা যারিয়াত : ২০-২১)

এভাবে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বহু আয়াতে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে বলেছেন।

প্রশ্ন-১:স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করল?

উত্তর :

স্রষ্টা এমন সত্তা যিনি সৃষ্ট নন, তিনি অস্তিত্বে আসেন নি বরং সর্বদা অস্তত্বিশীল এবং তিনি সৃষ্টিজগতের স্থান-কাল কাঠামোর অংশ নন । আর এজন্যই তিনি অসৃষ্ট বা অবস্তু, ফলে তাঁর সৃষ্ট হওয়ার প্রয়োজন নেই ।

এই যে মহাবিশ্ব কোন “জ্ঞানসম্পন্ন সত্তা” নয় যে নিজেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, পরিচালনা করতে পারে। বরং মহাবিশ্বের সকল ব্যবস্থা ও সকল অংশ ইংগিত করছে যে, তা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। এজন্য কোন স্রষ্টা ব্যতীত মহাবিশ্বের স্বয়ংসর্ম্পূণ অস্তিত্বের ধারণা সর্ম্পূণ যুক্তি বিরোধী, তাই এক্ষেত্রে একমাত্র যৌক্তিক সম্ভাবনা হচ্ছে এই যে, এর একজন জ্ঞানী স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রণকারী থাকতে হবে যিনি নিজে সৃষ্ট নন।

◆ এ সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

*বলুন, তিনি আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়

*আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী

*তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি

*এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।(সূরা ইখলাস:১-৪)

প্রশ্ন-২ আল্লাহ দয়ালু হলে জাহান্নাম কেন বানালেন?

উত্তর :

ন্যায়বিচারক আল্লাহ তার নবীগণের কাছে পাঠানো ওয়াহীর মাধ্যমে সঠিক পথের নির্দেশনা দিয়েছেন। যেন মানুষ ভুল না করে। মুমিনের জন্য আল্লাহর ভয় হলো তার ঈমানকে মজবুত করার অংশ। আল্লাহর প্রতি ভালবাসা, ভয় ও আশা তাহার অস্তিত্বে বিশ্বাসের নামান্তর।

একজন মুমিন আল্লাহর পুরষ্কার ও শাস্তি অর্জনের উপায় সম্পর্কে জানে। সে জন্য আল্লাহর শাস্তি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিকটবর্তী হতে চায়। এভাবেই তার আত্মিক পরিশুদ্ধি সম্পূর্ণ হয়।

সে আল্লাহর দেওয়া সীমা সমূহকে সম্মান করে, সচেষ্ট থাকে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ে আল্লাহর রহমতের খোজ করে। কারণ এটি তাকে বিচার দিবসের ভয়াবহ অবস্থা ও জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব থেকে রক্ষা করবে।

" যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দাড়ানোর পেশ রাখে তার জন্য রয়েছে দুটি জান্নাত" [সুরা আর-রহমান(৫৫):৪৫]

আল্লাহর বান্দাদের মাঝে কেবল জ্ঞানীরাই তাকে ভয় করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল"[সূরা আল-ফাতির:(৩৫):২৮]

"মুমিন তো তারাই যারা প্রতিফল দিবস কে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং তাদের পালনকর্তার শাস্তি সম্পর্কে ভীত প্রকম্পিত। নিশ্চয়ই তাদের পালনকর্তার শাস্তি সম্পর্কে নি:শংক থাকা যায় না।

[সূরা আল মাআরিজ (৭০):২৬-২৮]

তারা তাদের পালনকর্তা কে ডাকে ভয় ও আশা সহকারে। " [সূরা সাজদাহ,(৩২:৪৬)]

এ প্রসংগে নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,মুমিনের হৃদয় যখন ভয় ও আশায় পরিপূর্ণ হয়ে যায় আল্লাহ তখন তার আশা পূরণ করেন। এবং সে যার ভয় করে তা থেকে তাকে রক্ষা করেন। (ইবনে মাজাহ)

আখিরাত অস্বীকারকারীরা বিচার দিবস এ জান্নাত জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করলে তাদের অবস্থা কেমন হবে?

তারাই সত্যিকার ক্ষতিগ্রস্ত যারা তাদের নিজেদের ও পরিবারের ব্যাপার এ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাদের জন্য উপর ও নীচ হতে আগুনের জ্বালা থাকবে। এ শাস্তির দ্বারা আল্লাহ তার বান্দাদের সতর্ক করেন যে, হে আমার বান্দারা আমাকে ভয় কর।" (সূরা আয-যুমার৩৯:১৫-১৬)]

প্রশ্ন-৩ মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে স্রষ্টার কোনো দরকার আছে? মহাবিশ্ব শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে?

উত্তর :

সম্প্রতি বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে স্রষ্টার কোন দরকার নাই। মহাবিশ্ব শূন্য থেকেই সৃষ্টি হয়েছে।

প্রকৃতি শুন্যস্থান পছন্দ করে না। তাই, শুন্যস্থান পূরণ করতে আপনা আপনি কোয়াণ্টাম ফ্লাকচুয়েশন হয়ে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে।

শুন্য থেকেই মহাবিশ্ব সৃষ্টির কথা আল- কোরআন এ বলা আছে।

কোরআন যার কাছ থেকে এসেছে তিনিই তার সৃষ্টি জগতের সৃষ্টির ব্যখ্যা দিয়েছেন।

সূরা বাকারাহ এর ১১৭ নং আয়াত এ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "তিনি আসমান সমূহ ও যমীনের স্রষ্ঠা, আর যখন তিনি কোন বিষয় এর সিধান্ত নেন, তখন কেবল বলেন হও ফলে তা হয়ে যায় ""যিনি আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী কে অনঅস্তিত্ব হতে অস্তিত্ব এ আনায়ন করেন। (এখানে মূল শব্দ বাদ্যিয়ু সেখান থেকেই অস্তিত্ব অনঅস্তিত্বের

ধারণা। এবং যখন তিনি কিছু করবার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন শুধু বলেন হও আর তা হয়ে যায়"

Creator of the heavens and the earth from nothingness . He has only to say when He wills a thing, "Be" and it is....

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আমি কেবল নির্দেশ দিয়েছি"। "না, এমনি হয় নি, (শূন্য হতে এমনি এমনি পৃথিবীর সৃষ্টি হয় নি)। আমি যখন নির্দেশ করেছি হও "(কুন), তখন তা হয়ে গেল"।

উদাহরণস্বরূপ, একজন ম্যাজিশিয়ান ম্যাজিক দেখাচ্ছে। ম্যাজিশিয়ান স্টেজ এর এক কোণে বসে আছে। কিন্তু সে তার চোখের ইশারায় ম্যাজিক দেখাচ্ছে। দর্শক দেখছে খালি টেবিলের উপরে হঠ্যাৎ একটা কবুতর তৈরি হয়ে গেল এবং তা উড়েও গেল।

দর্শক কী বলবে এটা কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে হয়ে গেছে, না বলবে না।

এর পিছনে ম্যাজিশিয়ান এর কারসাজি আছে। সে স্টেজের এক কোণ থেকে চোখ দিয়ে ইশারা করছে বলেই এটা হয়েছে।

স্রষ্টাও সেরকম। তিনি বলেছেন "হও" আর মহাবিশ্ব আপনা আপনিই হয়ে গেল।

প্রশ্ন-৪ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কী সত্যিই ৩ টা সূরাকে কুরআন এর অংশ বলে মানতেন না?(প্রথম পর্ব)

উত্তর: মুয়াওয়িযাতাইন এর ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুর অবস্থান পৃথক পৃথকভাবে তুলে ধরা হল: নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতটি বর্ণণা করেন,

"[মুহাম্মদ (স)] সাতটি বারবার পঠিতব্য আয়াত এবং মহান কুরআন দিয়েছি।"" তিনি বলেন এ হচ্ছে ফাতিহাতুল কিতাব সূরা ফাতিহা ""।

"ইবনে মাসউদ (র.) থেকে আল্লাহর বাণীর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, "আমি তোমাকে বারবার সাতটি পঠিতব্য আয়াত এবং মহান কুরআন দিয়েছি। তিনি বলেন এ হচ্ছে ফাতিহাতুল কিতাব সূরা ফাতিহা। [আস সূয়ুতি দুরর মানসুর ফি তাফসির বিল মাসুর,"

"আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু যে সূরা ফালাক ও নাস কে কুরআন এর অংশ বলে মনে করতেন একথার পিছনে বেশ শক্তিশালী প্রমাণ রয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু থেকে বর্ণিত:

""দুইটি সূরা বেশি করে পড়ো আল্লাহ এর জন্য আখিরাতে তোমাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন। আর তারা হচ্ছে আল মুয়াওয়িযাতাইন (সূরা ফালাক ও নাস)। উৎস : আলী আল মুত্তাকী, কানজুল উম্মাল, বেরুত-আর রিসালাহ পাবলিকেশন্স,১৯৮১, হাদীস নং ২৭৪৩"

প্রশ্ন-৫ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কী সত্যিই ৩ টা সূরাকে কুরআন এর অংশ বলে মানতেন না?(দ্বিতীয় পর্ব)

উত্তর : কুরআন সংকলন ও সংরক্ষণকে প্রশ্নবিদ্ধ কারীরা (খ্রিস্টানমিশনারী, নাস্তিক মুক্তমনা ইসলাম বিদ্বেষী) যেসব অভিযোগ করে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর মাসহাফ (পূর্ণ কুরআন) এ ১১১ টি সূরা ছিল। এ বিষয়ে কয়েক টি বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য আছে।

বিভ্রান্তিগুলোর অপোনেদন করে নিম্ন সত্য বিষয় টা বর্ণিত হল-

আবদাহ এবং আসীম যির থেকে বর্ণণা করেছেন, তিনি বলেন, আমি উবাই (রা) কে বলেছি "আপনার ভাই ইবন মাসুদ (রা) সেগুলোকে (সূরা ফালাক ও নাস) তার মুসহাফ থেকে মুছে ফেলেছেন," এবং তিনি এতে কোন আপত্তি করলেন না"।

"এই বর্ণণাটিতে দেখা যাচ্ছে, সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সূরাগুলো মুছে ফেলেছেন শুনেও কুরআন এর আলিম সাহাবী উবাই বিন কাব (রা)

কোন আপত্তি বা প্রতিবাদ করছেন না। অথচ ইসলামের একটা সুপ্রতিষ্ঠিত আকীদা হচ্ছে, কেউ যদি কুরআন এর একটি আয়াতও অস্বীকৃতি করে তাহলে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় এএবং কাফির হিসেবে পরিগণিত হয়। অতএব সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যদি আসলেই কুরআন এর সূরাদ্বয়কে মানতে অস্বীকার , তাহলে (রা) অবশ্যই কোন না কোন প্রতিক্রিয়া দেখাতেন।

এ থেকে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে উবাই (রা) বুঝতে পেরেছিলেন যে ইবন মাসুদ রাদিআল্লাহু সূরাদ্বয়কে কুরআন এর অংশ হিসেবে মানতে অস্বীকার করছেন না। শুধুমাত্র নিজ মুসহাফ এ উল্লেখ করেন নি মাত্র।

আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হচ্ছে, যে আসীম ও যির এই রেওয়ায়েত এর বর্ণণাকারী তারা স্বয়ং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুর এর সূত্রে বর্ণিত কিরাত থেকে সূরা ফালাক ও নাস পাঠ করেছেন।

আব্দুর রহমান বিন ইয়াজিদ বর্ণ ণা করেছেন, ইবনে মাসুদ রাদিআল্লাহু মুওয়ায়িযাতাইন (সূরা ফালাক ও নাস) কে তার মুসহাফ থেকে মুছে ফেলেছেন এবং বলেছেন এগুলো কুরআনের অংশগ্রহণ নয়।" একই বিবরণ ইমাম তাবারানী(র) এর মু'জামুল কাবীরেও এসেছে।

এই বর্ণণা টি সত্য হতে পারে না। কেন না এটি একটি শাজ বা বিচ্ছিন্ন বর্ণণা। যা শুধুমাত্র আব্দুর রহমান বিন ইয়াজিদ বর্ণণা করেছেন। হাদিস শাস্ত্রে মুতওয়াতিরের বিপরীত এ বিচ্ছিন্ন বর্ণাণা দ্বারা কোন বিষয় প্রমাণিত হয় না। এমন কি এই বর্ণণার সনদ সহীহ হলেও। এক্ষেত্রে এক মুআল্লাল বা ত্রুটিপূর্ণ বর্ণণা বলে।

ইমাম নব বী (র) বলেন, " এ ব্যাপার এ মুসলিমগণের ইজমা রয়েছে যে, মুয়ায়িযাতাইন ও সূরা ফাতিহা কুরআন এর অংশ। এবং যে তা অস্বীকার করে সে কাফির হয়ে যায়। আর এব্যাপারে ইবনে মাসুদ রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু থেকে যা বর্ণিত আছে তা সহীহ নয়।

এছাড়া ইমাম ইবন হজম(র) থেকেও অনূরুপ বর্ণিত হয়েছে"।

ইমাম সুয়ুতি (র) আবু বকর আল বাকিলানি (র) থেকে উধৃত করেছেন, এটা মোটেও তার {ইবন মাসুদ (র)} থেকে প্রমাণিত নয় যে, এই সূরাদ্বয় কুরআন এর নংশ নয়। কুরআন এর অংশ হিসেবে অস্বীকার করে তবে তার মুসহাফ থেকে মোছেন নি, বাদ দেন নি। তার নিকট বিষয় টি এরূপ ছিল যে। তিনি নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ ব্যতীত কিছুই লিখতেন না। এবং তিনি এ ব্যাপার এ কিছু লিখত পাননি বা নির্দেশ শোনেন নি।"

উপরোক্ত দলিল প্রমাণসহ আলোচনা দ্বারা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হল যে,

সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর বিরুদ্ধে তিনটি সূরাকে (সূরা ফাতিহা, ফালাক ও নাস) কুরআন এর অংশ হিসেবে না মানার যে অভিযোগ তোলা হয় তা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত। সম্মানিত এই সাহাবী অন্য সবার ন্যায় একই কোরআন তেলওয়াত করতেন।

প্রশ্ন-৬ আল্লাহ রিজিকদাতা হলে মানুষ না খেয়ে মারা যায় কেন?

উত্তর: রিজিকের মালিক আল্লাহ এতে কোনো সন্দেহ নেই।

*ধনীদের সম্পদের গরীবের অধিকার রয়েছে।এ সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-- আর তাদের ধনসম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক।(সূরা যারিয়াত-১৯)

*রিজিকের জন্য নিজেদেরও চেষ্টা পরিশ্রম করতে হবে।

*আল্লাহ মানুষ রিজিক দিয়েও পরীক্ষা করেন

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে--

তিনিই তো তোমাদের জন্য যমীনকে সুগম করে দিয়েছেন, কাজেই তোমরা এর পথে-প্রান্তরে বিচরণ কর এবং তাঁর রিযক থেকে তোমরা আহার কর। আর তাঁর নিকটই পুনরুত্থান।(সূরা-মূলক:১৫)

আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।(সূরা-বাকারাহ-১৫৫)

*ইসলাম কখনোই বলে না মানুষ হাত পা গুটিয়ে বসে থাকুক এমনিতেই রিজিক আসবে।

নিশ্চয় আল্লাহ কোন কওমের অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।(সূরা-রাদ:১১)

প্রশ্ন-৭:আল্লাহ যদি অভাবগ্রস্থ না হন তাহলে ঋন চাইলেন কেন?

উত্তর:

আল্লাহকে ঋন দেয়ার অর্থ হলো আল্লাহর রাস্তায় দান করা।আল্লাহ কখনোই আমাদের সম্পদের মুখাপেক্ষী নন,বরং আমাদের যে সম্পদ রয়েছে সবকিছু আল্লাহই দেওয়া রিজিক।

◆ আল্লাহ বলেন--

কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, ফলে তিনি তার জন্য বহু গুণে বাড়িয়ে দেবেন? আর আল্লাহ সংকীর্ণ করেন ও প্রসারিত করেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে ফিরানো হবে।(সূরা-বাকারাহ-২৪৫)

এমন কে আছে যে, আল্লাহকে উত্তম করয দিবে ? তাহলে তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান।(সূরা-হাদিদ-১১)

◆ আল্লাহ সুবহানুতায়ালা কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন--

*হে মানুষ, তোমরা আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী আর আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিত।(সূরা-ফাতির-১৫)

*আল্লাহ অমুখাপেক্ষী।(সূরা-ইখলাস:২)

প্রশ্ন-৮:কোরআনের মত কোনো বই নাকি লেখা সম্ভব না? কোরআন তো চ্যালেন্জ দিয়াই খালাস, এই চ্যালেঞ্জ জাস্টিফাই করবে কে?

উত্তর:

কোরআনের সমতুল্য কোন বই এই পৃথিবীতে নাই । কোরআনের মিরাকলের শেষ নাই – কোরআনের বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন আয়াত, কোরআনের বিভিন্ন ভবিষ্যৎবানী, কোরআনের শব্দবিন্যাস, আরবী ভাষার উপর কোরআনের প্রভাব, কোরআন যেভাবে সংরক্ষিত হয়ে আসছে – এই প্রত্যেকটা ব্যাপারই এত ইউনিক যে পৃথিবীর আরো কোন বইতে এই বৈশিষ্ট্যগুলো নাই।

আয়াতের দিক থেকে কোরআনের অন্যতম ছোট সূরা হলো সূরা ইখলাস। প্রায় ১৪০০ বছর আগের সেই দিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অসংখ্য মানুষ এই সূরাটি পড়েছে, পড়ছে, মুখস্থ করেছে, করছে, ঠিক সেই উচ্চারণে যেই উচ্চারণে এটি প্রথমবার মানুষ শুনেছিলো।

এখন কেউ পারলে এরকম চারটি লাইন অন্য কোনো বই থেকে এনে দেখান যেটা হাজার বছর ধরে মানুষ এত গুরুত্বের সাথে আমল করছে।

এই চ্যালেঞ্জ কার্যকর কেউই করতে পারবে না।

◆ কুরআনে ইরশাদ হয়েছে--

তারা কি বলে, ‘সে(মুহাম্মাদ ﷺ)তা বানিয়েছে’? বল, ‘তবে তোমরা তার মত একটি সূরা (বানিয়ে) নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পারো ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও’।

(সূরা ইউনুস:৩৮)

প্রশ্ন-৯ আল্লাহ যত নবী পৃথিবীতে প্রেরন করেছেন,তাদেঁর মধ্যে একজনও কেন মহিলা নেই? পুরুষকে কেন নবী হিসাবে পাঠানো হয়েছে?

উত্তর :- আলহামদুলিল্লাহ্।

দায়িত্বের সমবন্টন ও ন্যায়বিচার-

সাধারন মানুষের চাইতে নবীগনের বেশি সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় এবং তা সমাধান করতে হয়। উদাহরন দ্বারা বলা যায়-

✔ নবীকে নামাযে ইমামতি করতে হবে যদি মহিলা ইমাম হয় আর পুরুষরা পেছনে থাকে তাহলেই আল্লাহর দিকে মনযোগের চাইতে উক্ত মহিলার দিকে মনযোগ বেশি যাবে। বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান সেটাই প্রমান করে।

✔ পয়গম্বরকে মানুষের সাথে মেলামেশা করতে হয়। হাত মেলাতে হয় যা শরীয়া অনুযায়ী নারী নবীর ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, একজন পুরুষ নবী সহজে করতে পারে।

✔ নবীকে অনেক মানুষের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে যা নারী নবীর ক্ষেত্রে সম্ভব নয়,

✔ সরকার প্রধান যদি মহিলা হয় তাহলে বিভিন্ন সময় ব্যক্তিবর্গের সাথে রুদ্ধদ্বার ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা করতে হয় যা ইসলামের আইনের খেলাফ,

✔ এছাড়া নারীগনকে বাচ্চা ১০ মাস ১০দিন গর্ভে ধারন করতে হয়। সংসার ছেলে-মেয়ে দেখাশুনা করতে হয় তার উপর যদি নবীর দায়িত্ব এলে তাহলে তা অবিচার হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন- ‘‘আমি ন্যায়বিচারক ও দয়ালু,

আল্লাহ নারীগনকে পবিত্র কুরআন অনেক সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। কুরআনে বলা হয়েছে বিবি মারিয়ম (আঃ) তিনি সমস্ত পৃথিবীর নারীশ্রেষ্ঠা, হযরত আয়েশা হযরত ফাতেমার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহতাআলা দায়িত্বের সমবন্টন করার ক্ষেত্রেই নারীগনকে নবী হিসেবে দুনিয়াতে পাঠাননি।আল্লাহ্ সবচেয়ে ভালো জানেন।

প্রশ্ন :১০-যদি আল্লাহর ইচ্ছাই সব হয়ে থাকে তাহলে নিজের ইচ্ছা বলতে কি কিছুই নেই?

উত্তর :- আলহামদুলিল্লাহ্

আল্লাহ বলেন-

”একটি পাতাও পরেনা আল্লাহর ইচ্ছে ছাড়া। সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছায় ঘটে, ”

আমৃত্যু স্বাধীন ইচ্ছা,একটা পরীক্ষা-

তবে প্রত্যেকেরই নিজস্ব ইচ্ছা আছে উদাহরন দ্বারা বলা যায়,

ধরুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে আপনার বাড়ি তথা প্রত্যেক এলাকার বিদ্যুৎ আসে। যদি কেউ নিজের আঙ্গুল কারেন্টের লাইনে রাখে সে ধাক্কা খাবে।

এটা তার দোষ, আল্লাহ তার ইচ্ছেকে স্বাধীন করে দিয়েছেন সে ইচ্ছে করলে বিদ্যুৎ হাত দেবে আর ইচ্ছা না করলে দেবেনা।

কিন্তু তার জন্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে দায়ী করা যাবেনা সুতরাং দোষটা পড়ে পুরুপুরি মানুষের- কেন সে বিদ্যুতে হাত দিলো?

আল্লাহ তার ইচ্ছেকে স্বাধীন করে দিয়েছেন কারন প্রত্যেকের স্বাধীন ইচ্ছা এক একটা পরীক্ষা।

জীবন পদ্ধতির সঠিক নিয়ম-কানুন-

আল্লাহ পবিত্র কুরআন ও রাসূল (صلى الله عليه و سلم) জীবনাদর্শে প্রকাশ করেছেন। সে যদি অনুসরন করে যত বছরই সে বাচুঁক ২০ বছর ৫০ বছর ১০০ বছর তার জীবন পদ্দতির ও স্বাধীন ইচ্ছার উপর ভিত্তি করেই বিচারের ফলাফল আল্লাহ প্রকাশ করবেন। আর যে যদি সেভাবে অনুসরন না করে সে অকৃতকার্য, আল্লাহ বলেন সুরা মুলক-৬৭: আয়াত-২-

‘‘ যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের যাচাই করতে যে তোমাদের মধ্যে কে কাজেকর্মে শ্রেষ্ঠ।’

আল্লাহ বলেন সুরা আনকাবুত ২৯: ২-৭

(২) মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?

(৩) আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে।

(৪) যারা মন্দ কাজ করে, তারা কি মনে করে যে, তারা আমার হাত থেকে বেঁচে যাবে? তাদের ফয়সালা খুবই মন্দ।

(৫) যে আল্লাহর সাক্ষাত কামনা করে, আল্লাহর সেই নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

(৬) যে কষ্ট স্বীকার করে, সে তো নিজের জন্যেই কষ্ট স্বীকার করে। আল্লাহ বিশ্ববাসী থেকে বে-পরওয়া।

(৭) আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদের মন্দ কাজ গুলো মিটিয়ে দেব এবং তাদেরকে কর্মের উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেব।

আল্লাহ্ সবচেয়ে ভালো জানেন।

প্রশ্নঃ১১ ইসলাম আকার বা মূর্তি পূজাকে প্রত্যাখ্যান করে কিন্তু তারা নিজেরাই কেন প্রার্থনায় কাবার প্রতি নত হয়ে তার উপাসনা করে?

উত্তরঃ আলহামদু লিল্লাহ।

কা'বা মুসলিমদের 'কেবলা'। মুসলিমরা তাদের প্রার্থনায় দিক নির্দেশক হিসেবে গণ্য করে। এখানে লক্ষ্য করার মতো বিষয় হলো, মুসলিমরা তাদের প্রার্থনায় কা'বার দিকে মুখ করে বটে তবে তারা কাবা ঘরের উপাসনা করে না। উপাসনা করে সেই ঘরের মালিক অদৃশ্য আল্লাহ তা'আলার। জ্যোতীর্ময় কুরআনে বলা হয়েছেঃ-

“তোমার (নির্দেশনার জন্য) বার বার আকাশের দিকে করে তাকানো আমরা দেখেছি। এখন আমরা কি তোমাকে ঘুরিয়ে দেব সেই কেবলার দিকে যা তোমাকে সন্তুষ্ট করবে? তাহলে ঘুরিয়ে নাও তোমরা থাকনা কেন (নামাযে) তার দিকেই মুখ ফিরিয়ে নেবে।”

ক. ইসলাম চূড়ান্ত ঐক্যকে উৎসাহিত করে যেমন, মুসলিমরা যদি নামায আদায় করতে চায় তাহলে এমনটা হতেই পারে যে, কারো ইচ্ছা হবে উত্তর দিকে ফিরে নামায পড়তে, কারো ইচ্ছা হবে দক্ষিণ দিকে দিকে ফিরতে।

তাই উপাসনার ক্ষেত্রেও মুসলিমদের চূড়ান্তভাবে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য যেখানেই তারা থাকনা কেন এক আল্লাহর প্রতি এক মুখী হয়ে তাদের নামায আদায় করতে বলা হয়েছে। ‘কাবা’ সেই একটি দিকের দিক-নির্দেশক, অন্য কিছুই নয়। কাবার পশ্চিমাঞ্চলে যে মুসলিমরা বাস করে তারা মুখ করবে পূর্ব দিকে আর তার পূর্বাঞ্চলে যারা বাস করে তারা মুখ করবে পশ্চিম দিকে। একইভাবে উত্তরাঞ্চলের লোকেরা দক্ষিণ দিকে আর দক্ষিণাঞ্চলের লোকেরা উত্তর দিকে।

খ. পৃথিবী গোলকের কেন্দ্রবিন্দু কা‘বা মুসলিমরাই প্রথম পৃথিবীর মানচিত্র এঁকেছিল। তাদের চিত্রে দক্ষিণ ছিল ওপর দিকে আর উত্তর ছিল নিচের দিকে। তখন কা‘বা ছিল কেন্দ্র বিন্দুতে।

পরবর্তিকালে পশ্চিমা মানচিত্রকররা পৃথিবীর যে মানচিত্র আঁকলো তাতে ওপর দিকটা নিচে আর নিচের দিকটা ওপরে অর্থাৎ উত্তর হলো ওপরের দিকে আর দক্ষিণ হলো নিচের দিকে। আলহামদুলিল্লাহ এ ক্ষেত্রেও “কাবাই মানচিত্রের কেন্দ্রবিন্দু থেকে গেল”।

গ. কা‘বাকে ঘিরে তওয়াফ করা আল্লাহর একত্বের নির্দেশক মুসলিমরা কা’বা যেয়ারতে মক্কায় গেলে ‘তাওয়াফ’ করে।

অর্থাৎ কা’বা ঘরকে কেন্দ্র করে চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে। কাজটি এক আল্লাহ বিশ্বাস ও উপাসনার নিদর্শন। প্রতিটি বৃত্ত গোলাকার এবং তার একটিই কেন্দ্র বিন্দু থাকে। কাজেই উপাসনার যোগ্য আল্লাহ-মাত্র একজনই, এটা তারই অন্যতম নিদর্শণ।

ঘ. হযরত উমর রাঃ এর হাদীস হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর সম্পর্কিত হযরত উমর রাঃ এর একটি বিখ্যাত উক্তি রয়েছে। হাদীসে শাস্ত্র অনুযায়ী যাকে 'আছার' বা ঐতিহ্য বলা যায়। বুখারী শরীফের হজ্জ সম্পর্কিত ৩৫৬ অধ্যায়ে ৬৭৫ নং হাদীসে, উমর রাঃ বলেছেন-

"আমি জানি তুমি একটি পাথরখন্ড মাত্র এবং না কোনো উপকার করতে সক্ষম না কোনো ক্ষতি। আমি যদি না দেখতাম খোদ আল্লাহর রাসূল (صلى الله عليه و سلم) তোমাকে স্পর্শ করেছেন তা হলে কস্মিন কালেও আমি তোমাকে স্পর্শ করতাম না।"

ঙ. মানুষ কা'বা ঘরের ওপরে উঠে আযান দিয়েছিল রাসূলুল্লাহ (صلى الله عليه و سلم) এর সময়ে লোকেরা কা'বা ঘরের ওপরে উঠে আযান দিত। মুসলিমরা কা'বা ঘরের উপাসনা করে বলে যারা মনে করেন তাদেরকে যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, কোন মুর্তি-পূজারী, যে মুর্তি সে পূজা করে, তার মাথার ওপরে উঠে দাঁড়ায়?

প্রশ্ন:১২ -মুসলিমগন কুরআনের আয়াত রহিতকরন বিস্বাস করেন তার মানে- সুষ্টিকর্তা ভুল করেছেন ও পরবর্তীতে সংশোধন করেছেন?

উত্তর :- আলহামদুলিল্লাহ্

আল্লাহ বলেন –

"আমি কোন আয়াত বা প্রকাশ রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি।" সুরা বাকারা-২, আয়াত-১০৬

আয়াতের অর্থ নিদর্শন এবং প্রকাশ। এই আয়াত দুভাবে বিশ্লেষন করা যায়-

১) প্রকাশ রহিত করা মানে পূর্ববর্তী যেসব কিতাব এসেছিল যেমন তাওরাত, যবুর ,ইঞ্জিল ইত্যাদিও চাইতেও তিনি উত্তম প্রকাশ অবর্তীন করি।

২) একে কুরানের আয়াত হিসাবে নিলে বোঝা যায় কোন আয়াত আল্লাহ রহিত করে এর পরিবর্তে তদপেক্ষা উত্তম আয়াত অবর্তীন করেন। দুটোই সঠিক।

দ্বিতীয় বিশ্লেষনকে অনেক অমুসলিমগন ভুল বোঝেন-

অনেকে মনে করেন অন্য আয়াতের সাথে এই আয়াতের গরমিল আছে। আল্লাহপাক বলেন কুরআনে –

“তারা কি বলে? কোরআন তুমি তৈরী করেছ? তুমি বল, তবে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা তৈরী করে নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পার ডেকে নাও, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়ে থাকে।” সুরা হুদ আয়াত-১৩

তারা এ দশ আয়াত রচনা করতে অপরাগতা প্রকাশ করলো। তারপর তিনি বলেন যদি তোমাদের ক্ষমতা থাকে তবে একটি-

”মানুষ কি বলে যে, এটি বানিয়ে এনেছ? বলে দাও, তোমরা নিয়ে এসো একটিই সূরা, আর ডেকে নাও, যাদেরকে নিতে সক্ষম হও আল্লাহ ব্যতীত, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।”

এরপর তিনি ফাইনাল চ্যালেঞ্জ দেন এরমতো কাছাকাছি (মিমমিছলিহি) একটি সুরা নিয়ে এস-

”এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকে সঙ্গে নাও-এক আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।”

তারমানে এটার মধ্যে মতদৈততা নেই-

মতদৈততা হলো দুটো ব্যাপার যেখানে একসাথে ঘটা সম্ভব নয়। যেমন আমি বললাম সে ক্লাস ১০ পাশ করতে পারবেনা এরপর আমি বললাম তুমি এমনকি ৫ম শ্রেনী পাশ করতে পারবেনা এরপর আমি বললাম তোমার ব্রেন এত খারাপ তুমি কেজি পাশ করতে পারবেনা। আমার উপরোক্ত বর্ননা চারটাই সত্যি ও কোন ভিন্নমত নেই।

মদের ব্যপারেও তিন স্তরে নিষিদ্ধতা এসেছে। একই সাথে নিষেধ হয়নি। যেমন আমি বললাম আমি বরিশালে থাকিনা এরপর বললাম আমি ঢাকায় থাকিনা এরপর বললাম জামালপুর থাকিনা আমার এই তিন বক্তব্য কোন মতদৈততা নেই উপরন্তু তথ্যবহুল।

আল্লাহ্ সবচেয়ে ভালো জানেন।

প্রশ্ন :১৩ - যদি আল্লাহ কাফেরদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেন তবে তাদের কেন দোষী সাবস্ত্য করা হয়?

উত্তর :- আলহামদুলিল্লাহ্।

আল্লাহ বলেন –

“আল্লাহ্ তাদের অন্তকরণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।” সুরা বাকারা-২, আয়াত-৭

অভিজ্ঞ শিক্ষক ও ভবিষ্যৎবানী-

আল্লাহ কাফেরদের হটকারিতার জন্য এই উক্তি করেছেন। তাদের কর্মের জন্য এমন দশা হয়েছে। তারমানে এই নয় যে তাদের কর্মফলের জন্য আল্লাহ দোষী। অপরাধী তারা নিজেই উদাহরন স্বরুপ একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক ভবিষ্যৎবানী করলেন কিছু ছাত্র ফেল করবে যেহেতু তারা সঠিক মতো লেখাপড়া ও রুটিন অনুসরন করেনি।

যদি ছাত্রগুলো ফেল করে আপনি কাকে দোষ দেবেন ছাত্রকে নাকি শিক্ষককে? দোষ ছাত্ররই একইভাবে আল্লাহ তাদের অন্তরে সিল মেরে দিয়েছেন কারন তারা ছিল অবাধ্য এই অবাধ্যতার দরুন তারা বিপথে চলে গেছে।

আল্লাহ্ সবচেয়ে ভালো জানেন।

প্রশ্ন :১৪ - যদি আল্লাহ কাফেরদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেন তবে তাদের কেন দোষী সাবস্ত্য করা হয়?

উত্তর :- আলহামদুলিল্লাহ্।

আল্লাহ বলেন –

"আল্লাহ্ তাদের অন্তকরণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।" সুরা বাকারা-২, আয়াত-৭

অভিজ্ঞ শিক্ষক ও ভবিষ্যৎবানী-

আল্লাহ কাফেরদের হটকারিতার জন্য এই উক্তি করেছেন। তাদের কর্মের জন্য এমন দশা হয়েছে। তারমানে এই নয় যে তাদের কর্মফলের জন্য আল্লাহ দোষী। অপরাধী তারা নিজেই উদাহরন স্বরুপ একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক ভবিষ্যৎবানী করলেন কিছু ছাত্র ফেল করবে যেহেতু তারা সঠিক মতো লেখাপড়া ও রুটিন অনুসরন করেনি।

যদি ছাত্রগুলো ফেল করে আপনি কাকে দোষ দেবেন ছাত্রকে নাকি শিক্ষককে? দোষ ছাত্ররই একইভাবে আল্লাহ তাদের অন্তরে সিল মেরে দিয়েছেন কারন তারা ছিল অবাধ্য এই অবাধ্যতার দরুন তারা বিপথে চলে গেছে।

আল্লাহ্ সবচেয়ে ভালো জানেন।

প্রশ্ন :১৫ ইসলাম কি বহু খোদায় বিস্বাস করে কারন অনেক স্থানে আমি-র পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করা হয়েছে?

উত্তরঃ আলহামদু লিল্লাহ। বহু ভাষায় দু'ধরনের বহুবচন আছে-

ইসলাম এক সৃষ্টিকর্তায় বিস্বাসী। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ নিজেই পবিত্র কুরআনে আমরা শব্দটি ব্যবহার করেছেন তারমানে এই নয় তিনি বহু। ভাষায় দু'ধরনের বহুবচন আছে একটি হল পরিমান বোঝাতে আরেকটি হল সম্মানার্থে।

ইংরেজিতে ইংল্যান্ডের রানীকে আমরা বলে সম্মানার্থে সম্বোধন করা হয়। যা রাজকীয় মর্যাদা। ইন্ডিয়াতেও রাজিব গান্ধি বলেন-'হাম দেখনা চাতেহে' এখানে হাম মানে আমরা এটি সম্মানার্থে ব্যবহার হয়েছে। একইভাবে আরবীতে 'নাহনু' শব্দটি মর্যাদা অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে।

ইসলাম এক সৃষ্টিকর্তায় বিস্বাসী-

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :-

''কুল হুয়াল্লাহু আহাদ'' ।অর্থাৎ তিনি এক ও অদ্বিতীয়। সুরা ইখলাস-১১২,আয়াত-১

প্রশ্ন :১৬ আল্লাহকে প্রশংসা করা কি প্রয়োজন? না করলে তিনি কেন আমাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন তবে তিনি কি করে রহিম হলেন?

উত্তর :- আলহামদুলিল্লাহ্।

আল্লাহ অল-রেডিই মহান-

ধরুন কেউ বললো আল্লাহু আকবার বা আল্লাহ মহান তার মানে এই নয় আল্লাহ তার প্রশংসার কারনে আরো মহান হয়ে গেলেন আল্লাহ অলরেডিই মহান যতই তাকে প্রশংসা করা হোক বা না হোক তিনি মহামহিম আছেন ছিলেন ও থাকবেন। আপনি তারঁ সমুদয় লাভের জন্য প্রশংসা করছেন না। আল্লাহ বলেন –

''হে মানুষ, তোমরা আল্লাহ্র গলগ্রহ। আর আল্লাহ্; তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।'' সুরা ফাতির-৩৫, আয়াত-১৫

তারঁ প্রশংসা করা প্রয়োজন আমাদের লাভের জন্য-

আল্লাহ সমস্ত চাওয়া-পাওয়া থেকে মুক্ত। তারঁ প্রশংসা করা প্রয়োজন আমাদের লাভের জন্য। আপনি এমন কারো সম্মান করবেন যে সর্বজ্ঞ, অত্যন্ত সুক্ষদর্শী ও সব কিছু যার আয়ত্বাধীন, তারঁ প্রশংসা করে আপনি নিজেকে সন্তুষ্ট করবেন। এজন্যই প্রত্যেক মুসলিম প্রতি নামাযের শুরুই করে তাকে মর্যাদাসূচক উক্তি করে।

আপনি আল্লাহর প্রশংসা যতই করেন তা শেষ হবার নয়-

মুসলিমগন তার প্রশংসা করে নিজেকে পরিতুষ্ট করেন যে তিনিই একমাত্র সাহায্যকারী ও পরিত্রানকারী। ধরুন আপনি হার্টের রোগি, আপনার অসুস্থতার উপশমের জন্য আপনি কি রাস্তার যে কারো থেকে উপদেশ নিবেন নাকি যে হার্টের উপর খুব বিখ্যাত স্পেশালিষ্ট তার কাছ থেকে নিবেন আপাত দৃষ্টিতে তার কাছ থেকেই উপদেশ নিবেন যিনি এ ব্যপারে অভিজ্ঞ।

অতএব আল্লাহর প্রশংসা আমাদের নিজেদের উপকার ও স্বাথের জন্য। আপনি যতই আল্লাহর প্রশংসা করেন তা শেষ হবার নয় কারন আল্লাহ বলেন-

‘‘হে মুহাম্মাদ! বলো, যদি আমার রবের কথা লেখার জন্য সমুদ্র কালিতে পরিণত হয় তাহলে সেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে কিন্তু আমার রবের কথা শেষ হবে না। বরং যদি এ পরিমাণ কালি আবারও আনি তাহলে তাও যথেষ্ট হবে না। ’’ সুরা কাহাফ-১৮, আয়াত-১০৯

আরও বলা হয়েছে –

‘‘পৃথিবীতে যত গাছ আছে তা সবই যদি কলম হয়ে যায় এবং সমুদ্র (দোয়াত হয়ে যায়) , তাকে আরো সাতটি সমুদ্র কালি সরবরাহ করে তবুও আল্লাহর কথা (লেখা) শেষ হবে না। অবশ্যই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও জ্ঞানী। সুরা লুকমান-৩১, আয়াত-২৭

আল্লাহ আপনার ইবাদতের মুখাপেক্ষী নন। আপনি যতই প্রশংসা করেন তা শেষ হবেনা। এবং তা করবেন আপনার জন্য।

আল্লাহ্ সবচেয়ে ভালো জানেন।

প্রশ্নঃ১৭ বিজ্ঞান আমাদের বলে, যে যা খায় তার আচরণে তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। তাহলে ইসলাম কেন মুসলিমদেরকে আমিষ খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দেয়। যেখানে পশুর মাংস ব্যক্তিকে হিংস্র ও দুঃসাহসী করে তুলতে পারে?

উত্তরঃ আলহামদু লিল্লাহ।

ক. পশুর মধ্যে শুধু তৃনভোজী পশু খাওয়া অনুমোদিত

এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ একমত যে, ব্যক্তি যা আহার করে তার প্রতিক্রিয়া তার আচরণে প্রকাশ পায়। বাঘ, সিংহ, নেকড়ে ইত্যাদি হিংস্র মাংসাশী প্রাণী খাওয়া ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে- এটা তার অন্যতম একটি কারণ। এ ধরনের হিংস্র হয়ে উঠতে পারে। সে কারণে ইসলাম শুধু মাত্র গরু, মহিশ, ছাগল, ভেড়ার মতো শান্ত ও খুব সহজে পোষমানা প্রাণীর মাংস খেতে অনুমতি দেয়। বস্তুত এ কারণেই মুসলিমরা শান্তিকামী-শান্তিপ্রিয়।

খ. জ্যোতির্ময় কুরআন বলছে- যা কিছু মন্দ রাসূল তা নিষিদ্ধ করেছেন-

"রাসূল তাদেরকে ভালো কাজ করতে আদেশ করেন। আর নিষেধ করেন যাবতীয় মন্দ থেকে এবং তিনি তাদের জন্য হালাল করেছেন যা কিছূ ভাল, পবিত্র, পরিচ্ছন্ন। আর হারাম করেছেন যা কিছু মন্দ অপরিচ্ছন্ন অপবিত্র। " (সুরা আরাফ-৭: ১৫৭)

"রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দেন তা তোমরা গ্রহণ করো। আর যে সব থেকে নিষেধ করেন সে সব থেকে বিরত থাকো। " (সুরা হাশর-৫৯ : ৭)

একজন মুসলিমের জন্য তাদের রাসূলের এই বার্তার যথেষ্ট যে, আল্লাহ চান না মানুষ এমন কোনো ধরনের মাংস খায়- যেখানে অন্য কিছু ধরনকে (শান্ত-শিষ্ট পশুকে আহারের) অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

গ. মাংসাশী প্রাণী খাবার ব্যাপারে রাসূল (صلى الله عليه و سلم)-এর বাণী সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত বেশ কিছু সর্বসম্মত শুদ্ধ হাদীসের মধ্যে ইবনে আব্বাস রাঃ বর্ণিত মুলিম শরীফের 'শিকার ও জবাই' অধ্যায়ের ৪৭৫ নং হাদীসে, সুনানে ইবনে মাজাহর

১৩ অধ্যায়ের ৩২৩২ থেকে ৩২৩৪ হাদীস সমূহ উল্লেখযোগ্য। রাসূল (صلى الله عليه و سلم) খেতে নিষেধ করেছেনঃ

১.তীক্ষ্ণ ধারালো দাঁতওয়ালা হিংস্র জন্তু। অর্থাৎ মাংসাশী বন্য পশু প্রধানত বেড়াল ও কুকুর জাতীয় বাঘ, সিংহ, বেড়াল এবং শেয়াল, কুকুর, নেকড়ে, হায়না ইত্যাদি।

২. তীক্ষ্ণ দন্ডের অন্যান্য প্রাণী যেমন ইঁদুর, ন্যাংটি ইদুর, ছুঁচো ও ধারালো নখওয়ালা খরগোশ ইত্যাদি।

৩. সরিশ্রীপ জাতীয় অন্যান্য প্রাণী যেমন সাপ কুমীর ইত্যাদি।

৪. ধারালো ঠোঁট ও নখরওয়ালা শিকারী পাখি যেমন চিল, শুকুন, কাক, পেচাঁ ইত্যাদি। সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করতে পারে এমন কোনো বৈজ্ঞানীক দলিল নেই যে, আমিষ খাদ্য গ্রহণের ফলে মানুষ উগ্র ও হিংস্র হয়ে উঠতে পারে।

প্রশ্ন :১৮ -আল-কুরআন সংকলন করা হয়েছে তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ) এর আমলে। তাহলে কিভাবে আল্লাহর আয়াত বলা যায়?

উত্তর :- আলহামদুলিল্লাহ্।

আয়াত বা সূরা নাযিলের পরপর সাহাবাদের মুখস্ত করতে ও লিখে রাখতে নির্দেশ দেয়া হত:-

এটা বলা ভুল যে হযরত ওসমান (রাঃ) কুরআন সংকলন করেছেন প্রকৃতপক্ষে রাসুল (ﷺ)-এর জীবিতকালে কুরআন সংকলন ও সংরক্ষিত হয়েছিল। যখন কোন আয়াত রাসুল (ﷺ) এর প্রতি নাযিল হতো তিনি অনতিবিলম্বে তা মুখস্ত করে নিতেন এবং সাহাবাদের শোনাতেন এবং তাদেঁর মুখস্ত করতে ও লিখে রাখতে নির্দেশ দিতেন,এবং তিনি সাহাবাদের পড়িয়ে শোনাতে বলতেন শুদ্ধতা যাচাই করতেন অর্থাৎ সাহাবীদের স্মরন শক্তি পরীক্ষা করে দেখতেন ।

তিনি সাহাবাদের সুরার ধারাবাহিকতা বলে রাখতেন ,যেমন-প্রথম যে সুরা নাযিল হয়েছে সুরা ইকরা যা পবিত্র কুরআনে ৯৬নং সূরা যা তিনি জীবরঈল (আঃ) এর মাধ্যমে জানতে পেরেছেন । বর্তমানে যে পর্যায় ক্রমিক সূরায় কুরআন সংকলিত আছে তার অনুরূপ 'লাওহে মাহফুজে' লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রতি রমজানে রাসুল(ﷺ) জীবরাঈল (আঃ) দ্বারা পুনরাবৃত্তি করতেন । তাঁর মৃত্যুকালীন বছরে রমজানের সময় তিনি দুবার পুনরাবৃত্তি করছিলেন।

কুরআন একত্রিকরন-

কুরআন সংরক্ষিত হয়েছিল বিভিন্ন আঙ্গিকে-গাছের বাকলে,চমড়ায় ,উটের সেডলে ,সমতল পাথরে,গাছের পাতায়। ১ম খলীফা আবু বকর (রাঃ) এর খিলাফত কালে ইয়ামামার যুদ্ধে বহু কুরআনে হাফেজ শহীদ হন। হযরত আবু বকর (রাঃ)ও ওমর (রাঃ) সাহা

বীগনের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে যয়িদ-বিন-সাবিদ(রাঃ)-কে কুরআন সংকলনের জন্য দায়িত্ব প্রদান করেন। সব সাহাবীদের একসাথে করে যয়িদ-বিন-সাবিদ (রাঃ) সব কুরআনের আয়াতকে একসাথে করেন। এরপর তা দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) এর তত্তাবধানে আসলে তাঁর হাত হতে হযরত হাফসা (রাঃ) এর নিকট পৌঁছায়।

হযরত ওসমান (রাঃ) খিলাফতকাল-

তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রাঃ) এর সময় ইসলাম যখন প্রসার লাভ করছিল । বিভিন্ন স্থানের মধ্যে উচ্চারনগত সমস্যা দেখা দেয়ায় তিনি বিভিন্ন দেশের কুরআন হাফেজ এবং সংকলকদেরকে ডেকে পাঠান

ও হযরত হাফসা (রাঃ) এর নিকট হতে সংরক্ষিত কুরআন লিখে রাখতে বলেন ও তা সম্প্রচার করতে বলেন আর বাকী কুরআন তিনি পুড়িয়ে ফেলতে নির্দেশ দেন, কারন সব সাহাবীদের পক্ষে সমস্ত কুরআনের আয়াত সংরক্ষিত ছিলনা কারো কাছে ছিল ৫০০ আয়াত বা তার কম বা বেশি। পূর্বের কুরআনে হুবহু তুর্কির ফাত্তাকি যাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে ।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন সূরা হিজর-১৫,আয়াত-৯-

“আমরা কুরআন অবতীর্ন করেছি এবং আমরাই এর সংরক্ষনকারী।”

প্রশ্নঃ১৯- ইসলাম একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয় কেন? অথবা ইসলামে বহু-বিবাহ অনুমোদিত কেন?

উত্তরঃ আলহামদু লিল্লাহ।

ক. বহু-বিবাহের সংজ্ঞা ‘বহু-বিবাহ’ মানে এমন একটি বিবাহ পদ্ধতি যেখানে এক ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী থাকে। বহু-বিবাহ দুই ধরনের- একজন পুরুষ একাধিক নারীকে বিবাহ করে। আর একটি ’বহু স্বামীবরণ’।

অর্থাৎ একজন স্ত্রীলোক একাধিক পুরুষ বিবাহ করে। ইসলামে পুরুষের জন্য সীমিত সংখ্যক ‘বহু-বিবাহ’ অনুমোদিত। অপর দিকে নারীর জন্য একাধিক পুরুষ বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ‘হারাম’।

এবার মূল প্রশ্নে আসা যাক। কেন একজন পুরুষ একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি পায়?

খ. পৃথিবীতে কুরআ’নই একমাত্র ধর্ম-গ্রন্থ, যে বলে “বিবাহ করো মাত্র একজনকে” ভূ-পৃষ্টের ওপরে কুরআনই একমাত্র ধর্ম-গ্রন্থ যা এই বাক্যাংশ ধারণ করে আছে-“বিবাহ করো মাত্র একজনকে” আর কোনো ধর্ম-গ্রন্থ নেই, যা পুরুষকে নির্দেশ একজন স্ত্রীতে সন্তুষ্ট থাকতে।

অন্য কোনো ধর্ম-গ্রন্থ -হোক তা বেদ, রামায়ন, মহাভারত, গীতা, অন্যদিকে তালমুদ অথবা বাইবেল। এ সবের মধ্যে স্ত্রীদের সংখ্যার ওপর কোনো বিধিনিষেধ বের করতে পারবে কি কেউ? বরং এসব ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী একজন পুরুষ বিবাহ করতে পারে যতজন তার ইচ্ছা।

এটা অনেক পরের কথা যে, হিন্দু ধর্ম গুরু এবং খ্রীস্টান চার্চ স্ত্রীর সংখ্যা ‘এক’ এ নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছে।

অসংখ্য ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব তাদের ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী একাধিক স্ত্রী রেখেছে। যেমন রামের পিতা রাজা দশরথ। ভগবান শ্রী কৃষ্ণের তো অনেক স্ত্রী ছিল!

বাইবেল যেহেতু স্ত্রীদের সংখ্যার ওপর কোনো বিধিনিষেধই নেই। সেহেতু আগের কালের খ্রীস্টান পুরুষরা যে-ক'জন খুশি স্ত্রী রাখতে পারত। মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে তাহাদের চার্চ্চ স্ত্রীর সংখ্যা 'এক' এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। ইহুদীবাদে বহু বিবাহ অনুমোদিত। তাদের তালমুদিয় বিধান অনুযায়ী আব্রাহামের [ইব্রাহীম (আ)] তিনজন স্ত্রী ছিল এবং সলোমনের [সুলাইমান (আ)]-এর ছিল শতাধিক স্ত্রী।

বহু-বিবাহের এই প্রথা চলে আসছিল তাদের "রাব্বাঈ" জারসম বিন ইয়াহুদাহ্ পর্যন্ত। (৯৬০ সি.ই থেকে ১০৩০ সি.ই) তিনিই এর বিরুদ্ধে একটি অনুশাসন জারি করেন। ইহুদীদের 'সেফারডিক' সমাজ যারা প্রধানত মুসলিমদের দেশগুলোতে বসবাস করে তারা এই প্রথাকে নিকট অতীতের ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ধরে রাখে। অতঃপর ইসরাঈলের প্রধান রাব্বাঈ একাধিক স্ত্রী রাখার ওপর বিধিনিষেধ জারি করে দেয়।

একটি লক্ষণীয় বিষয়ঃ ১৯৭৫ সালের আদম-শুমারী অনুযায়ী ভারতীয় হিন্দুরা বহু বিবাহের ক্ষেত্রে মুসলিমদের চাইতে অগ্রগামী।

কমিটি অফ দি স্টাটাস অফ ওমেন ইন ইসলাম (ইসলামে নারীর মর্যাদা কমিটি) নামে এ বইটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৫ সালে। বইয়ের ৬৬ ও ৬৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, একাধিক স্ত্রী গ্রহণ-সংক্রান্ত বিবাহ, হিন্দুদের মধ্যে শতকরা পাঁচ দশমিক শূন্য ছয় (৫.০৬%) আর মুসলিমদের মধ্যে চার দশমিক তিন এক (৪.৩১%)।

ভারতীয় আইন অনুযায়ী একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমোদন শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য নির্ধারিত। ভারতে যেকোনো অমুসলিমের জন্য একাধিক স্ত্রী রাখা অবৈধ। এটা অবৈধ হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমদের তুলনায় হিন্দুরাই একাধিক স্ত্রী বেশি রাখছে।

এর আগে তো কোনো বিধিনিষেধই ছিলনা। এমনকি হিন্দু পুরুষদের ক্ষেত্রেও একাধিক স্ত্রী রাখা অনুমোদিত ছিল। এই তো সেদিন ১৯৫৮ সালে হিন্দু বিবাহ-বিধি অনুমোদিত হলো এভাবে যে, একজন হিন্দুর জন্য একাধিক স্ত্রী রাখা অবৈধ।

বর্তমানে এটা একটা ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আইন। যা নিয়ন্ত্রিত করেছে একজন হিন্দু পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখতে- "হিন্দু ধর্ম-গ্রন্থ" নয়।

আসুন এবার দেখা যাক ইসলাম কেন একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয়।

গ. কুরআন একাধিক বিবাহের নিয়ন্ত্রিত রূপকে অনুমতি দেয় আমি আগে যেমন বলে এসেছি ভূ-পৃষ্ঠের ওপরে কুরআনই একমাত্র ধর্মীয় গ্রন্থ যা বলে 'বিবাহ করো মাত্র একজনকে'। কথাটি জ্যোতির্ময় কুরআনের সূরা নিসার নিম্নদ্ধৃত আয়াতের অংশ-

"বিবাহ করো তোমাদের পছন্দের নারী- দু'জন অথবা তিনজন অথবা চারজন কিন্তু যদি আশঙ্কা করো যে, তোমরা (তাদের সাথে) ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ করতে না-ও পারতে পারো- তাহলে মাত্র একজন। " (৪:৩)

কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে বহু-বিবাহের কোনো মাত্রা নির্ধারিত ছিল না এবং ক্ষমতাবান প্রায় প্রতিটি মানুষ এতে অভ্যস্ত ছিল। কেউ কেউ তো শ' এর মাত্রা ছাড়ালে ক্ষান্ত হতো না।

কুরআন সর্বোচ্চ চার জনের একটা মাত্রা নির্ধারণ করে দিল। ইসলাম একজন পুরুষকে দুজন, তিনজন অথবা চারজনের যে অনুমতি দিয়েছে তা কঠিন শর্তের মধ্যে আবদ্ধ যে, কেবলমাত্র তখনই তা সম্ভব যখন তাদের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ সুবিচারমূলক আচরণ করতে পারবে।

প্রশ্ন-২০ ইসলামে শূকর খাওয়া হারাম কেন? অথচ শূকর আল্লাহরই একটি সৃষ্টি। হারামই যদি হয় তাহলে আল্লাহ শূকরকে সৃষ্টি করলেন কেন?

উত্তর :

মহান প্রতিপালক আমাদের জন্য শূকর খাওয়া অকাট্যভাবে নিষিদ্ধ করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন--

বল, 'আমার নিকট যে ওহী পাঠানো হয়, তাতে আমি আহারকারীর উপর কোন হারাম পাই না, যা সে আহার করে। তবে যদি মৃত কিংবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের গোশ্ত হয়- কারণ, নিশ্চয় তা অপবিত্র কিংবা এমন অবৈধ যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য যবেহ করা হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে তা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে, তাহলে নিশ্চয় তোমার রব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।(সূরা আনআম: ১৪৫)

যারা অনুসরণ করে রাসূলের, যে উম্মী নবী; যার গুণাবলী তারা নিজদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত পায়, যে তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেয় ও বারণ করে অসৎ কাজ থেকে এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে আর অপবিত্র বস্তু হারাম করে। আর তাদের থেকে বোঝা ও শৃংখল- যা তাদের উপরে ছিল- অপসারণ করে। সুতরাং যারা তার প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং তার সাথে যে নূর নাযিল করা হয়েছে তা অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।(সূরা আরাফ: ১৫৭)

শূকর নাপাক ও নিকৃষ্ট প্রানী এ ব্যাপারে আমরা এক মূহুর্তের জন্যই। সন্দেহ পোষণ করি না।

শূকর ময়লা আবর্জনা খেয়ে জীবন ধারন করে।

এর গোশত মানবদেহের জন্য ক্ষতিকারক,বিভিন্ন ধরনের মারাত্নক রোগ সৃষ্টির কারন হতে পারে।

আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে এমন অনেক কষ্টদায়ক বা অপবিত্র বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং এর পিছনে অনেক হিকমাহও রয়েছে।

সৃষ্টিকর্তার এই অধিকার অবশ্যই রয়েছে যে তিনি তার বান্দাদের যা খুশি নির্দেশ করবেন,এ ব্যাপারে সমালোচনার অবকাশ নেই।

তাই মাখলুক হিসেবে আমাদের কর্তব্য হলো শুনলাম এবং মানলাম।

প্রশ্ন:২১ আল্লাহ যদি সর্বশক্তিমান এবং পরম করুনাময় হন, তাহলে পৃথিবীতে এত দু:খ-কষ্ট কেন?

উত্তর:

পৃথিবীতে দুঃখ-কষ্ট থাকলেও পৃথিবীতে অনেক আনন্দও আছে। বরং, পৃথিবীতে আনন্দই বেশী, নাহলে অধিকাংশ মানুষ বেঁচে থাকতে চাইত না।

*বলুন, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জন্য যে সব সুশোভন বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, তা কে নিষিদ্ধ করেছে? বলুন, এসব তো ঈমানদারদের জন্য – পার্থিব জীবনে এবং বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে।(সূরা আ'রাফ:৩২)

আল্লাহ্ আমাদের বিভিন্ন কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলেন, যাতে আমরা শিক্ষাগ্রহণ করতে পারি এবং কঠিনতর পরিস্থিতির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারি।

*তিনি (আল্লাহ্) বললেন: আমি যা জানি তোমরা তা জান না। (সূরা বাক্বারাহ্:৩০)।

এই পৃথিবীটা হলো একটা পরীক্ষার জায়গা। আল্লাহ্ বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করছেন। এই পরীক্ষা আনন্দদায়ক হতে পারে, আবার কষ্টেরও হতে পারে।

◆ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

নিশ্চয়ই আমি তোমাদের (কাউকে) ভয় ও ক্ষুধা দিয়ে, আর (কাউকে) ধনেপ্রাণে বা ফলফসলের ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে পরীক্ষা করব। আর যারা ধৈর্য ধরে তাদের তুমি সুখবর দাও। (তারাই ধৈর্যশীল) যাদের ওপর কোন বিপদ এলে বলে,

নিশ্চয় আমরা আল্লাহরই জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তারই দিকে ফিরে যাব'। এদের উপর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে শান্তি ও করুণা বর্ষিত হয় এবং এরাই সুপথগামী। (সূরা-বাক্বারাহ:১৫৫-১৫৭)

আল্লাহ্ মানুষকে পরীক্ষা করেন বিভিন্ন আনন্দদায়ক ও দু:খজনক ঘটনার মাধ্যমে। এই জীবন শুধুই একটা পরীক্ষাকেন্দ্র, পরকালের জীবনই আসল জীবন।

*আর পার্থিব জীবন তো ক্রীড়াকৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয়; আর সাবধানীদের জন্য পরকালের আবাসই ভালো; তোমরা কি বোঝ না? – (সূরা আন'আম:৩২)

প্রশ্ন-২২ ইসলামে মহিলারা কেন একই সময়ে একাধিক পুরুষকে বিয়ে করতে পারে না?

উত্তর:

আল্লাহ তায়ালা ইসলামে মহিলাদেরকে একই সময়ে একাধিক পুরুষকে বিয়ের অনুমতি দেন নি এর অনেক হিকমাহ রয়েছে।

এজন্য দেখা যায় যে,পৃথিবীতে মুসলিম নারীর চেয়ে পবিত্র ও বিশুদ্ধ নারী অন্য কোন ধর্মে নেই।

একজন পুরুষের একধিক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তার পরিবারে জন্মগ্রহণকারী শিশুদের মাতা-পিতার পরিচয় খুব সহজেই পাওয়া যায়। শিশুর পিতা কে আর মাতা কে। অপরদিকে একজন নারী যদি একাধিক স্বামী গ্রহণ করে তবে এ পরিবার জন্ম নেয়া শিশুর শুধু মায়ের পরিচয় পাওয়া যাবে-বাবার নয়। পিতা ও মাতার সুস্পষ্ট পরিচয়ের ক্ষেত্রে ইসলাম আপোসহীন। আধুনিক মনোবিজ্ঞানিরা বলেন, যে শিশু তার মাতা-পিতার পরিচয় জানে না, বিশেষ করে পিতার- সে শিশু তীব্র মানসিক জটিলতা ও হীনমন্যতায় ভোগে।

আল্লাহ তায়ালা কোনো তালাক প্রাপ্ত নারীকেও দ্বিতীয় বিয়ের পূর্বে তিন মাসের একটি গ্যাপ রাখতে বলেছেন।

◆ তিনি পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন--

'তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন মাসিক পর্যন্ত অপেক্ষা করবে' (সূরা আল-বাকারাহ:২২৮)

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখে যে, প্রথম মাসিক আসার পর একজন মহিলার শরীর থেকে ৩২% থেকে ৩৫% পর্যন্ত প্রোটিন শেষ হয়ে যায়,

এবং দ্বিতীয় মাসিক আসার পর তার শরীর থেকে ৬৭% থেকে ৭২% ডিএনএ ধ্বংস হয়ে যায়।

আর তৃতীয় মাসিকের পর ৯৯.৯% পর্যন্ত প্রোটিন নির্মূল হয়ে যায়। এরপর জরায়ু আগের ডিএনএ থেকে সম্পন্নরূপে পরিষ্কার হয়ে যায় এবং কোন প্রকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই নতুন ডিএনএ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকে।

এজন্য যদি একই সাথে বেশ কয়েকজনের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করে, তাহলে তার শরীরে বিভিন্ন ধরণের ডিএনএ জমা হয় যা বিপজ্জনক ভাইরাসের রূপ নেয় এবং মারাত্মক রোগ সৃষ্টির কারণ হয়।

বিধবা মহিলার ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান হলো, তার ইদ্দত তালাকপ্রাপ্ত মহিলার চেয়ে বেশি অর্থাৎ ৪ মাস ১০ দিন।

এর কারণ হলো দুঃখ ও দুশ্চিন্তার কারণে তার শরীর থেকে প্রাক্তন ডিএনএ দ্রুত শেষ হয় না,এটি শেষ হতে আগের চেয়ে বেশি সময় লাগে, আর এ জন্য মহিলাদের ইদ্দত চার মাস দশ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে।

◆ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন--

'তোমাদের মধ্য হতে যারা স্ত্রীদেরকে রেখে মারা যাবে সে অবস্থায় স্ত্রীরা নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন বিরত রাখবে।' (আল-বাকারাহ, ২৩৪)

এজন্য ইসলামে একজন মহিলার জন্য একই সময়ে একাধিক বিয়ে বা একাধিক স্বামী রাখার অনুমতি দেয়া হয়নি।

আহলে হক মিডিয়া তে প্রদত্ত নাস্তিক ও ইসলাম বিদ্বেষীদের বিভ্রান্তিকর কতিপয় প্রশ্নোত্তর নিম্নে বর্ণিত হল-

প্রশ্ন:১পায়ূপথে বায়ু বের হলে হাত মুখ কেন ধৌত করতে হয়?

পায়ুপথ দিয়ে বাতাস বের হলে, কেন অজু ভেঙে যায়? এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা চাই। যেহেতু আবার হাত মুখ ধৌত করলেই অজু হয়ে যায়। অথচ পায়ুপথের কোনো ধৌত করেন না?

উত্তর

بسم الله الرحمن الرحيم

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার নাম দ্বীন ইসলাম বা শরীয়ত নয়। দ্বীন হলো আল্লাহ তাআলা এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ ও নিষেধ মানার নাম।

যদি মানুষের বুদ্ধি বিবেক এবং বিজ্ঞান দিয়ে সবই জানা যেতো, তাহলে আর ঐশী গ্রন্থ নাজিলের কোন প্রয়োজনই হতো না। কেবল মাত্র মানুষের বুদ্ধি বিবেক এবং আকল দিয়েই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো।

মানুষের বুদ্ধি বিবেক তথা বিজ্ঞান যেখানে অকার্যকর সেখানেই ঐশী জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার সূচনা।

বাতকর্ম দ্বারা অজু ভঙ্গ হওয়ার বিষয়টিও তেমনি। এখানে যুক্তি নয়। ঐশী নির্দেশ মান্য করা হিসেবে হাত মুখ ও পা ধৌত করতে হয়।

আপনি আমাকে এ প্রশ্নের উত্তর দেন যে, **কারো পিছনের রাস্তায় অর্শ বা ভগন্দর রোগ হলো, সেই হিসেবে তাকে সেই রাস্তা দিয়েই অষুধ প্রবেশ করানো দরকার। কিন্তু তাকে মুখ দিয়ে কেন অষুধ খাওয়ানো হয়?**

এটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কী?

আসলে যুক্তির নাম দ্বীন নয়। দ্বীন হলো আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম মানার নাম। **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ**

হযরত আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, শরীর থেকে যা কিছু বের হয় এ কারণে অযু ভেঙ্গে যায়, প্রবেশের দ্বারা ভঙ্গ হয় না। [সুনানে কুবরা লিলবায়হাকী, হাদীস নং-৫৬৮]

قَالَ عَطَاءٌ: «تَوَضَّأْ مِنْ كُلِّ حَدَثٍ مِنَ الْبَوْلِ، وَالْخَلَاءِ، وَالْفُسَاءِ، وَالضُّرَاطِ، وَمِنْ كُلِّ حَدَثٍ يَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ

হযরত আত্বা রহঃ বলেন, অযু কর প্রত্যেক হদসের কারণে। যেমন পেশাব, পায়খানা, বায়ু বের হওয়া শব্দসহ বা শব্দ ছাড়া। প্রতিটি বস্তু যা মানুষের শরীর থেকে বের হয়। [মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক-১/১৩৯, হাদীস নং-৫২৭]

لأن غسل غير موضع الإصابة أمر تعبدى (هداية، أشرفى-1\23)

لأن غسل غير موضع الإصابة أمر تعبدى، أى أمر تعبدنا به، أى كفلنا الله به من غير معنى يعقل، إذا العقل إنما يقتضى وجوب غسل موضع أصابته النجاسة، فيقتصر على مورد الشرع (عناية مع فتح القدير، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، زكريا-1\42، دار الفكر-1\39، كويته-1\34، البناية، زكريا=1\269)

والله اعلم بالصواب

যদি আগের নবীগণ মুসলিম নাই হতেন, তাহলে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের জন্মের এতো আগের নবী নূহ আলাইহিস সালাম কিভাবে নিজেকে মুসলিম দাবী করছেন? এর মানে বুঝা গেল, সমস্ত নবীগণই মুসলিম ছিলেন।

২

কুরআন নাজিলের মাধ্যমে আগের সমস্ত আসমানী কিতাবের বিধানাবলী রহিত হয়ে গেছে। আগেকার আসমানী গ্রন্থের ঐ সকল বিধানই কেবল গ্রহণযোগ্য হবে, যা কুরআনে কারীম সাপোর্ট করেছে। বা সমালোচনা ছাড়া বর্ণনা করেছে। এছাড়া সকল

বিধানই রহিত। এটা মুসলিম উম্মাহের সর্বসম্মত একটি আকীদা। এটা অস্বিকার করলে ঈমান থাকবে না। ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যাবে।

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

এবং (হে রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আমি তোমার প্রতিও সত্যসম্বলিত কিতাব নাযিল করেছি, তার পূর্বের কিতাবসমূহের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে। সুতরাং তাদের মধ্যে সেই বিধান অনুসারেই বিচার কর, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন। আর তোমার নিকট যে সত্য এসেছে তা ছেড়ে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তোমাদের মধ্যে প্রত্যেক (উম্মত)-এর জন্য আমি এক (পৃথক) শরীয়ত ও পথ নির্ধারণ করেছি। আল্লাহ চাইলে তোমাদের সকলকে একই উম্মত বানিয়ে দিতেন। কিন্তু (পৃথক শরীয়ত এজন্য দিয়েছেন) যাতে তিনি তোমাদেরকে যা-কিছু দিয়েছেন, তা দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন। সুতরাং তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর। তোমাদের সকলকে আল্লাহরই দিকে ফিরে যেতে হবে। অতঃপর যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছিলে সে সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন। [সূরা মায়েদা-৪৮]

এ আয়াতের পরিস্কারভাবেই আগের নবীদের উপর নাজিলকৃত কিতাবের বিধানাবলীর মাঝে কিছু বিষয় যা কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে, কেবল তারই অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। সেই সাথে একথাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, সব নবীর শরীয়ত এক নয়। প্রত্যেক নবীর উপর নাজিলকৃত শরীয়তই পালন করতে হবে। আগের নবীর শরীয়ত নয়।

কুরআন রেখে আগের উম্মতের খেয়াল খুশির অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

যা পরিস্কার প্রমাণ করে যে, কুরআন আগের আসমানী গ্রন্থাবলীকে রহিত করে দিয়েছে। কেবল কুরআন সমর্থিত আগের আসমানী গ্রন্থের বিধানই মানা যাবে। স্বতন্ত্রভাবে আগের আসমানী কিতাব মানা যাবে না। কারণ, তার বিধানাবলী রহিত হয়ে গেছে।

আর এমনটি করা হয়েছে বান্দাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য।

وَعَنْ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَتَاهُ عُمَرُ فَقَالَ إِنَّا نَسْمَعُ أَحَادِيثَ مِنْ يَهُودَ تُعْجِبُنَا أَفْتَرَى أَنْ نَكْتُبَ بَعْضَهَا؟ فَقَالَ: «أَمُتَهَوِّكُونَ أَنْتُمْ كَمَا تَهَوَّكَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘উমার (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন, আমরা ইয়াহূদীদের নিকট তাদের অনেক ধর্মীয় কথাবার্তা শুনে থাকি। এসব আমাদের কাছে অনেক ভালো মনে হয়। এসব কথার কিছু কি লিখে রাখার জন্য আমাদেরকে অনুমতি দিবেন? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ইয়াহুদী ও নাসারাগণ যেভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, তোমরাও কি (তোমাদের দীনের ব্যাপারে) এভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছ? আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের কাছে একটি অতি উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ দীন নিয়ে এসেছি। মূসা (আঃ)-ও যদি আজ দুনিয়ায় বেঁচে থাকতেন, আমার অনুসরণ ব্যতীত তাঁর পক্ষেও অন্য কোন উপায় ছিল না। [মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১৪৭৩৬, মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং-১৭৭]

والله اعلم بالصواب

(البداية النهاية، قصة هود عليه السلام-283)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ «. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اتَّخِذُوا الْخَيْلَ وَاغْتَبِقُوهَا فَإِنَّهَا مِيرَاثُ أَبِيكُمْ إِسْمَاعِيلَ» . وَكَانَتْ هَذِهِ الْعِرَابُ وَحْشًا فَدَعَا لَهَا بِدَعْوَتِهِ الَّتِي كَانَ أُعْطِيَ فَأَجَابَتْهُ، وَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْعَرَبِيَّةِ الْفَصِيحَةِ الْبَلِيغَةِ، وَكَانَ قَدْ تَعَلَّمَهَا مِنَ الْعَرَبِ الْعَارِبَةِ الَّذِينَ نَزَلُوا عِنْدَهُمْ بِمَكَّةَ مِنْ جُرْهُمٍ وَالْعَمَالِيقِ وَأَهْلِ الْيَمَنِ مِنَ الْأُمَمِ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنَ الْعَرَبِ قَبْلَ الْخَلِيلِ.

قَالَ الْأُمَوِيُّ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنَا مِسْمَعُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ آبَائِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ فَتَقَ

صَدَقْتَ يَا لِسَانُهُ بِالْعَرَبِيَّةِ الْبَيِّنَةِ إِسْمَاعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً» . فَقَالَ لَهُ يُونُسُ أَبَا يَسَارٍ. هَكَذَا أَبُو جُرَيٍّ حَدَّثَنِي.

وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ تَزَوَّجَ لَمَّا شَبَّ مِنَ الْعَمَالِيقِ امْرَأَةً، وَأَنَّ أَبَاهُ أَمَرَهُ بِفِرَاقِهَا فَفَارَقَهَا. قَالَ الْأُمَوِيُّ: وَهِيَ عِمَارَةُ بِنْتُ سَعْدِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ أَكِيلَ الْعِمْلَاقِيِّ، ثُمَّ نَكَحَ غَيْرَهَا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَسْتَمِرَّ بِهَا فَاسْتَمَرَّ بِهَا، وَهِيَ السَّيِّدَةُ بِنْتُ مُضَاضِ بْنِ عَمْرٍو الْجُرْهُمِيُّ (البداية والنهاية، ذكر اسماعيل عليه السلام-1/444-445)

والله اعلم بالصواب

বয়স হয়েছিল ৪০ বছর।

যে খাদিজা রাঃ এর ইতোপূর্বে দুইবার বিবাহ হয়েছিল। দুইবারই স্বামী ইন্তেকাল করেছেন। পূর্বের স্বামী থেকে তিনজন সন্তানও জন্ম নিয়েছিল।

যদি রাসূল সাঃ নারীলোভীই হতেন [নাউজুবিল্লাহ] তাহলে ২৫ বছরের যুবক হয়ে, দুই দুইবারের বিধবা নারী, তাও ৪০ বছরের মধ্যবয়স্কা এক নারীকে কেন বিয়ে করলেন?

২৫ বছর বয়সে ৪০ বছর বয়স্কা একজনকে বিবাহ করার পর উক্ত নারীকে নিয়ে যৌবনের পূর্ণ সময় কাটিয়ে দিলেন। বিয়ের পর কেটে গেল আরো ২৫টি বছর।

এ ২৫ বছরের মাঝে তথা হযরত খাদিজা রাঃ এর জীবদ্দশায় রাসূল সাঃ দ্বিতীয় কোন বিবাহ করেননি। তার থেকেই রাসূল সাঃ এর চার কন্যা, যয়নব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম এবং ফাতিমা রাঃ জন্মগ্রহণ করেন। এবং দুই ছেলে জন্ম নেন।

এছাড়া শুধু মারিয়া কিবতিয়া রাঃ এর গর্ভেই রাসূল সাঃ এর এক সন্তান জন্ম নিয়েছিল। এছাড়া আর কোন স্ত্রীর গর্ভে রাসূল সাঃ এর কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেননি।

হযরত খাদিজা রাঃ যখন ইন্তেকাল করেন, তখন রাসূল সাঃ এর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। ৫৫ বছর মানেই বার্ধক্যে উপনীত।

তাহলে যৌবনকাল থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত একজন মধ্য বয়স্কা দুইবারের বিধবা নারীকে নিয়ে ঘরসংসার করলেন মহানবী সাঃ। এর মাঝে দ্বিতীয় কোন নারীর দিকে তাকাননি।

তারপরও নারীলোভী বলে যে অমানুষগুলো অভিযোগের আঙ্গুল তুলে তাদের রুচিবোধ ও আকল নিয়ে আমাদের সন্দেহ জাগে।

হযরত খাদিজা রাঃ এর ইন্তেকালের পর, রাসূল সাঃ ৫৫ বছর বয়স থেকে ৬৩ বছর বয়স পর্যন্ত মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নানা পারিপার্শিক ও রাজনৈতিক কারণে বাকি দশজন নারীকে বিয়ে করেন। যাদের শুধু একজন ছিলেন কুমারী। বাকি ৯ জনই ছিলেন বিধবা নারী।

তাকে বিবাহ করতে হবে।

এটাই আল্লাহর ফায়সালা। যা অহীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দেন।

কিন্তু রাসূল সাঃ উক্ত বিষয়টিকে প্রকাশ করতে আরবের মুশরিকদের অপপ্রচার ও বিভ্রান্তির ভয় পাচ্ছিলেন। কারণ, আরবে পোষ্যপুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করাকে অবৈধ মনে করা হয়। খুবই অশোভন মনে করা হয়। অথচ এটি মোটেও অশোভন কিছু ছিল না।

লোক লজ্জার ভয়ে রাসূল সাঃ উক্ত বিষয়টিকে জনসম্মুকে বলতে ভয় পাচ্ছিলেন। তাই তা মনের মাঝেই গোপন করে রাখেন।

এরই মাঝে একদিন যায়েদ বিন হারেছা এসে জানান যে, তিনি স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন। তখন রাসূল সাঃ চুপ করে রইলেন।

যখন যয়নবের ইদ্দত সম্পন্ন হয়ে যায়, তখন রাসূল সাঃ হযরত যায়েদের মাধ্যমেই হযরত জয়নব রাঃ এর কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান।

সেসময় সুরা আহযাবের এ ৩৭ নং আয়াত নাজিল হয়।

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا [৩৩:৩৭]

আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন;আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন;তাকে যখন আপনি বলেছিলেন,তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর। আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন,যা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দেবেন আপনি লোকনিন্দার ভয় করেছিলেন অথচ আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত। অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল,তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোন অসুবিধা না থাকে। আল্লাহর নির্দেশ কার্যে পরিণত হয়েই থাকে। [সূরা আহযাব ৩৩: ৩৭]

যাতে আল্লাহ তাআলা পরিস্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, পোষ্যপুত্রের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিবাহ করা এটি সম্পূর্ণই বৈধ। এতে দোষের কিছু নেই। আর যায়েদ জয়নবকে তালাক দিবে, পোষ্যপুত্রের তালাকপ্রাপ্তাকেই রাসূল সাঃ এর বিবাহ করতে হবে, একথা আল্লাহর বিধান হওয়ার পরও রাসূল সাঃ লোকলজ্জার ভয়ে তা প্রকাশ করতে দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন। অথচ আল্লাহ তাআলাই অধিক ভয় পাবার যোগ্য।

অবশেষে অহীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তা প্রকাশ করে দিলেন। সেই সাথে আল্লাহ তাআলা নিজেই রাসূল সাঃ ও যয়নব রাঃ এর বিবাহে আসমানে সম্পন্ন করে দিলেন। [ঈষৎ সংক্ষেপিত: সীরাতুল মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উর্দু-৩/২৯৫-২৯৯, ইদ্রিস কান্ধলবী রহঃ কৃত]

তাহলে এ আয়াতে কি পেলাম?

পোষ্যপুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করার কুপ্রথা বিলুপ্তকরণের জন্য রাসূল সাঃ আল্লাহর নির্দেশে বিবাহ করলেন।

كُلِّ دَابَّةٍ، وَكُلِّ طَيْرٍ، وَكُلِّ شَيْءٍ (تفسير ابن كثير-1\223، سورة البقرة، تحت رقم الآية-31)

৪

ইবলিশ জিনজাতির অন্তর্ভূক্ত হবার পরও ফেরেশতাদের মাঝে থাকার কারণে সেও ফেরেশতাদের নির্দেশকৃত বিধানের অন্তর্ভূক্ত ছিল। এটা ইবলিশ নিজেও জানতো।

এ কারণেই ইবলিশ এ অভিযোগ করেনি যে, আমিতো ফেরেশতা নই, আমি কেন ফেরেশতাদের আদেশ করা সেজদার নির্দেশ অগ্রাহ্য করায় নাফরমান সাব্যস্ত হবো?

যদিও ইবলিস সেজদা না দিতে এ যুক্তি দিয়েছে যে, সে আগুনের তৈরী আর আদম মাটির তৈরী, তাই সে উত্তম। এ কারণে সে সেজদা দিবে না।

কিন্তু ইবলিশ একথা বলেনি যে, আমি ফেরেশতাদের অন্তর্ভূক্ত নই, তাই ফেরেশতাদের সেজদার নির্দেশের আওতাধীন হিসেবে আমার সেজদা দেয়ার কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

এর মানে বুঝা গেল যে, ইবলিস জানতো উক্ত নির্দেশে সেও শামিল। সুতরাং এ প্রশ্নটা আমাদের পক্ষ থেকে করাটা অযৌক্তিক ও অসাড়।

وَالْغَرَضُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ دَخَلَ إِبْلِيسُ فِي خِطَابِهِمْ؛ لِأَنَّهُ -وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ عُنْصرهم -إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَدْ تشَبَّه بِهِمْ وَتَوَسَّمَ بِأَفْعَالِهِمْ؛ فَلِهَذَا دَخَلَ فِي الْخِطَابِ لَهُمْ، وَذُمَّ فِي مُخَالَفَةِ الْأَمْرِ (تفسير ابن كثير-1\230)

قَالَ [اللَّهُ] تَعَالَى لِلْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ إِبْلِيسَ خَاصَّةً دُونَ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ فِي السَّمَاوَاتِ: اسْجُدُوا لِآدَمَ. فَسَجَدُوا كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ، لِمَا كَانَ حَدَّثَ نَفْسَهُ مِنَ الْكِبْرِ وَالِاغْتِرَارِ. فَقَالَ: لَا أَسْجُدُ لَهُ، وَأَنَا خَيْرٌ مِنْهُ وَأَكْبَرُ سِنًّا وَأَقْوَى خَلْقًا، خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. يَقُولُ: إِنَّ النَّارَ أَقْوَى مِنَ الطِّينِ (تفسير ابن كثير-1\228، سورة القرة، تحت رقم الآية-34)

والله اعلم بالصواب

৯

ড্রাইভার বা সঞ্চালক থাকলে কেন তার নির্দিষ্ট পদ্ধতেই গাড়ি চালাতে হবে? [যেমন নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছার জন্য গাড়িটি ব্যবহার করা। সেটি ব্যবহারের যেসব নীতিমালা

রয়েছে সেগুলো যথাযথ প্রয়োগ করা, যেমন গাড়িতে ফুয়েল বা গ্যাস ভর্তি করা, চাকায় পাম্প থাকা ইত্যাদি]

২

বাড়ির নির্মাতা থাকলে কেন তার একটা মাকসাদ থাকতেই হবে? [যেমন বসবাসের জন্য বাড়ি নির্মাণ, অফিস আদালতে জন্য নির্মাণ, অবকাশ যাপনের জন্য নির্মাণ ইত্যাদি]

উপরোক্ত দু'টি প্রশ্ন আপনার কাছে কেমন মনে হচ্ছে?

হাস্যকর ও বাচ্চাসূলভ নয়কি?

যখন কোন কিছু নির্মিত হতে হলে নির্মাতা স্রষ্টা লাগেই। তখন সেই স্রষ্টার কিছু নিয়মনীতি থাকবেই। তার কিছু বিধানাবলী থাকবেই। তিনি এসব অহেতুক নির্মাণ করেন না। তার একটি মাকসাদ থাকে। সেই মাকসাদ পূর্ণ করার জন্য তিনি কিছু বিধি-নিষেধ করবেনই। এটাই স্বাভাবিক। এটাই স্বাভাবিক বিবেক ও বুদ্ধির দাবি।

তেমনি এ বিশ্ব চরাচর যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানবমন্ডলী সৃষ্টি করেছেন। সেই মহান স্রষ্টা আল্লাহ এসব অহেতুক সৃষ্টি করেননি। তারও কিছু নিয়মনীতি আছে। বিধি-নিষেধ আছে। মহান স্রষ্টা আল্লাহর নিয়মনীতি আর বিধি-নিষেধের নামই হল ধর্ম।

যা অমান্য করা স্রষ্টার নীতিকে অগ্রাহ্য করা। যা গর্হিত অপরাধ ছাড়া আর কী' হতে পারে?

যেমন বাড়ি নির্মাণ করা হল বসবাসের জন্য। কিন্তু বসবাসের নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে, সেটিকে কামার খানা হিসেবে ব্যবহার শুরু হয়ে গেল।

যে মাকসাদে নির্মাতা বাড়ি নির্মাণ করলেন। সেই মাকসাদের উল্টো ব্যবহার সেটির মূল অবস্থা নষ্ট করে দেয়া হল, উপযোগী রাখা হলো না, নির্মাতার উদ্দেশ্যের বিপরীত তা ব্যবহার করে নষ্ট করে দেয়া হল, তাহলে নির্মাতাতো ক্ষিপ্ত হবেই। তিনিতো এর জন্য শাস্তি দিবেনই। এটাই কি স্বাভাবিক নয়?

আশা করি সহীহ সমঝ ও আকল থাকলে উপরোক্ত দু'টি প্রশ্নের অসাড়তা পরিস্কার হয়ে গেছে।

قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ [١٣:١٦

বলুনঃ আল্লাহই প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনি একক, পরাক্রমশালী। [সূরা রা'দ-১৬]

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ [٣:٨

হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্যলংঘনে প্রবৃত্ত করোনা এবং তোমার নিকট থেকে আমাদিগকে অনুগ্রহ দান কর। তুমিই সব কিছুর দাতা। [সূরা আলেইমরান-৮]

والله اعلم بالصواب

আম্বিয়া-২১: ৩৩]

প্রতিটি জীবন্ত প্রাণী পানি থেকে সৃষ্ট!

আজ তা বৈজ্ঞানিক সত্য। কিন্তু একথা সাড়ে চৌদ্দশত বছর আগেই পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান।

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ [٢١:٣٠

এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না? [সূরা আম্বিয়া-২১: ৩০]

বিজ্ঞানের বিভিন্ন থিউরী উল্টে গেছে, কিন্তু পবিত্র কুরআনে বর্ণিত কোন থিউরীই উল্টানো যায়নি। যা প্রমাণ করে পবিত্র কুরআন, কোন মানবরচিত গ্রন্থ নয়। বরং স্রষ্টার নাজিলকৃত কিতাব।

এরকম আরো অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। যা যেকোন বিবেকবান ব্যক্তিকে ইসলাম ধর্মই একমাত্র অবিকৃত ও ঐশী ধর্ম বলে প্রমাণ করবে।

তারপরও যদি কারো ইসলাম ধর্মকে সত্য ধর্ম হিসেবে মানতে সমস্যা হয়, তাহলে তাকে কপালপোড়া এবং হতভাগা ছাড়া আর কী'বা বলতে পারি?

والله اعلم بالصواب

দাওয়াহ দেওয়ার পদ্ধতি :

দাওয়াহ দেওয়ার অন্যতম কার্যকর পদ্ধতি হচ্ছে কথোপকথন। নিম্নে আস্তিক এবং নাস্তিক ও ইসলাম বিদ্বেষীদের মধ্যে একুশটি বিষয় এ কথোপকথন বা সংলাপ লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরা হল-

১) স্রষ্টার অস্তিত্ব কি আছে?

রাজিব: তুমি মুসলিম, তুমি আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস কর?

মুনতাসির: হ্যা আমি মুসলিম, আমি আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করি।

রাজিব: তুমি কি কখনো তাকে দেখেছ?

মুনতাসির: না,আমি তাকে কখ দেখে নি।

রাজিব: তুমি কি কখনো তার কথা শুনেছ?

মুনতাসির: না,আমি তার কথা কখনো শুনি নি।

রাজিব:তুমি কি তাকে কখনো স্পর্শ করেছাে?

মুনতাসির:না,আমি তাকে কখনো স্পর্শ করি নি।

রাজিব: তুমি কি কখনো তাঁর স্বাদ গ্রহণ করেছাে?

রাজিব: না,আমি কখনো তার স্বাদ গ্রহণ করি নি।

রাজিব:তাহলে তোমার রব আল্লাহর কোন অস্তিত্ব নেই,কারণ তুমি যাকে কখনো দেখ নি, যার কথা কখনো শুনো নি, যাকে কখনো স্পর্শ করোনি, যার স্বাদ গ্রহণ করোনি তার কোনো অস্তিত্বই নেই।

মুনতাসির:আপনার কি আকল (বিবেক-বুদ্ধি) আছে?

রাজিব:হ্যা আছে।

মুনতাসির:আপনি কি আপনার বিবেক কখনো দেখেছেন?

রাজিব: না, আমি তা কখনো দেখি নি।

মুনতাসির:আপনি কি এর কোনো কথা কখনো শুনেছেন?

রাজিব:না আমি এর কোনো কথা কখনো শুনি নি।

মুনতাসির: আপনি কি কখনো এর স্বাদ গ্রহণ করেছেন?

রাজিব: না,আমি কখনো এর স্বাদ গ্রহণ করি নি।

মুনতাসির:তাহলে তো বলতে হয় আপনার কোনো বিবেক নেই।

রাজিব:না,অবশ্যই আমার বোধশক্তি আছে।

মুনতাসির:আপনি কীভাবে জানলেন যে, আপনার বোধশক্তি আছে?

রাজিব: আমি এর প্রভাব টের পাই। অর্থাৎ এর বিভিন্ন নিদর্শন থেকে আমি আমার আকলের(বিবেক) অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারি, তাহলে কীভাবে বলবো যে, আমার কোনো বিবেক নেই?

সঠিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন নিদর্শন দেখে বুঝবে যে, তার জ্ঞান আছে। যখন দেখা যাবে, সে সবকিছু সঠিকভাবে সম্পাদন করছে, উল্টোপাল্টা কিছু করছে না, তখন মানুষ তাকে বলবে, সে জ্ঞানী, তার বিবেক-বুদ্ধি ঠিক আছে।

তুমি আমাকে বলো—আমরা কীভাবে জানবাে যে, স্রষ্টার অস্তিত্ব আছে?

মুনতাসির: আমরা তাঁর নিদর্শন দেখে, তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টি দেখে; আসমান, যমিন, পাহাড়-পর্বত দেখে এবং আমাদের নিকট যে অবিকৃত কুরআন আছে, এ-মুজেযা দেখে জানতে

পারবাে যে, আল্লাহ আছেন আর এসবকিছুই বলে দেয় যে, এক আল্লাহর অস্তিত্ব বিদ্যমান।

আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তাঁর মহাসত্তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন—

اَفِي اللهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ.

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ব্যাপারে কি তোমরা সন্দেহের মধ্যে রয়েছ? (সূরা ইবরাহীম - ১০)

আল্লাহ তাআলা মহাজগতে তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণকারী নিদর্শনাবলির প্রতি নির্দেশ করে বলেছেন—

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ،الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰي جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ،رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ اَنْصَارٍ.

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রজনীর পরিবর্তনে অবশ্যই নিদর্শনাবলি রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্নদের জন্য। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও পার্শ্বশয়নে আল্লাহকে স্মরণ করে। আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করে ও বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করোনি। তুমি পবিত্র মহান। তুমি আমাদেরকে রক্ষা করো জাহান্নামের শাস্তি থেকে ।

(সূরা আলে ইমরান: ১৯০-১৯১)

অস্তিত্ব প্রমাণকারী নিদর্শনাবলির প্রতি নির্দেশ করে বলেছেন—

বিশ্বাসীগণের বিবেকের কাছে এ প্রশ্ন রেখে কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে—

وَ فِي الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ،وَ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ، وَ فِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَ مَا تُوْعَدُوْنَ.

আর বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে আমার নিদর্শনাবলি এবং স্বয়ং তোমাদের মাঝেও। সুতরাং তোমরা কি অনুধাবন করবে না? আকাশে বরাদ্দ করে রাখা হয়েছে তোমাদের জীবনোপকরণ ও তোমাদেরকে যা কিছুর প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। (সূরা যারিয়াত : ২০-২১)

এভাবে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বহু আয়াতে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে বলেছেন।

রাজিব:হুম...

২) আল্লাহ দয়ালু হলে জাহান্নাম কেন বানালেন?

রবিন: হাই! আব্দুল্লাহ কোথায় যাচ্ছো?

আব্দুল্লাহ : মসজিদে যাচ্ছি। নামায পড়তে হবে।

রবিন : মসজিদে যেতে হবে না। চল সিনেমা দেখতে যায়।

আব্দুল্লাহ : না যাব না ভাই। নামায না পড়লে পরকাল এ ভয়াবহ জাহান্নামে যেতে হবে।

রবিন: তোদের আল্লাহ দয়ালু হলে জাহান্নাম কেন বানালেন?

আব্দুল্লাহ: আচ্ছা ভাইয়া, আমাদের মা একদিকে খুব দয়াদ্র, আবার অন্যদিকে শাস্তদাতা। আমরা যখন মায়ের আদেশ অমান্য করি, কোন অপরাধ করি, অন্য ভাইবোনদের সাথে অন্যায় আচরণ করি তখন তিনি আমাদের শাস্তি দেন। তার অর্থ এই নয় যে তিনি দয়ালু নন। বরং তিনি ন্যায়বিচার করেন। অপরাধ করলে মা শাস্তি দিবেন এই ভয় যখন একজন সন্তানের মধ্যে গ্রোথিত হয় তখন সে আর অপরাধমূলক কাজ করে না।

ঠিক তেমনি পরম দয়ালু আল্লাহ মহান্যায়বিচারক। যদি জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তির বিধান না থাকত। তাহলে পৃথিবীতে এক বান্দা আর এক বান্দার উপর কেবল জুলুম করে যেত, অপকর্মে সারা দুনিয়া নরকে পরিণত হত। মানুষ দুনিয়া তে ভালো কাজ করত না। আর আল্লাহ তায়ালা তো বলেছেন আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি আমার

ইবাদত এর জন্য। তাহলে যারা ইবাদত করে না, আল্লাহর নাফরমানি করে যায় তাদের কেন কোন শাস্তি হবে না?

রবিন : ঠিক বলেছ তুমি। আমি আল্লাহ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতাম।

আব্দুল্লাহ : আলহামদুলিল্লাহ, আপনি যে এখন বুঝতে পেরেছেন।

তবে আপনার প্রশ্নটা আল্লাহ আছে কি না এবং আল্লাহর ন্যায়বিচার কে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

রবিন: তাহলে আল্লাহর অস্তিত্ব ও ন্যায়বিচার এর বিষয় টা সংক্ষেপে বুঝিয়ে বল।

আব্দুল্লাহ : বলছি ভাইয়া। মনোযোগ দিয়ে শোনেন।

ন্যায়বিচারক আল্লাহ তার নবীগণের কাছে পাঠানো ওয়াহীর মাধ্যমে সঠিক পথের নির্দেশনা দিয়েছেন। যেন মানুষ ভুল না করে। মুমিনের জন্য আল্লাহর ভয় হলো তার ঈমানকে মজবুত করার অংশ। আল্লাহর প্রতি ভালবাসা, ভয় ও আশা তাহার অস্তিত্বে বিশ্বাসের নামান্তর।

একজন মুমিন আল্লাহর পুরষ্কার ও শাস্তি অর্জনের উপায় সম্পর্কে জানে। সে জন্য আল্লাহর শাস্তি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিকটবর্তী হতে চায়। এভাবেই তার আত্মিক পরিশুদ্ধি সম্পূর্ণ হয়।

সে আল্লাহর দেওয়া সীমা সমূহকে সম্মান করে, সচেষ্ট থাকে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ে আল্লাহর রহমতের খোজ করে। কারণ এটি তাকে বিচার দিবসের ভয়াবহ অবস্থা ও জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব থেকে রক্ষা করবে।

কুরআন মাজীদ এ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

" যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দাড়ানোর ভয় রাখে তার জন্য রয়েছে দুটি জান্নাত" [সুরা আর-রহমান(৫৫):৪৫]

আল্লাহর বান্দাদের মাঝে কেবল জ্ঞানীরাই তাকে ভয় করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল"[সূরা আল-ফাতির:(৩৫):২৮]

"মুমিন তো তারাই যারা প্রতিফল দিবস কে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং তাদের পালনকর্তার শাস্তি সম্পর্কে ভীত প্রকম্পিত। নিশ্চয়ই তাদের পালনকর্তার শাস্তি সম্পর্কে নি:শংক থাকা যায় না।

[সূরা আল মাআরিজ (৭০):২৬-২৮]

তারা তাদের পালনকর্তা কে ডাকে ভয় ও আশা সহকারে। " [সূরা সাজদাহ,(৩২:৪৬)]

এ প্রসংগে নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,মুমিনের হৃদয় যখন ভয় ও আশায় পরিপূর্ণ হয়ে যায় আল্লাহ তখন তার আশা পূরণ করেন। এবং সে যার ভয় করে তা থেকে তাকে রক্ষা করেন। (ইবনে মাজাহ)

রবিন: আখিরাত অস্বীকারকারীরা বিচার দিবস এ জান্নাত জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করলে তাদের অবস্থা কেমন হবে?

আব্দুল্লাহ : এ বিষয় এ আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীম এ বলেছেন,

‘তারাই সত্যিকার ক্ষতিগ্রস্ত যারা তাদের নিজেদের ও পরিবারের ব্যাপার এ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাদের জন্য উপর ও নীচ হতে আগুনের জ্বালা থাকবে। এ শাস্তির দ্বারা আল্লাহ তার বান্দাদের সতর্ক করেন যে, হে আমার বান্দারা আমাকে ভয় কর।" (সূরা আয-যুমার ৩৯:১৫-১৬)

রবিন : অনেক ধন্যবাদ আব্দুল্লাহ। তোমার আলোচনা আমাকে মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে দৃঢ় করল। এখনই আমি প্রকৃত মুসলিম হচ্ছি - 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ" । মসজিদে চল। আমি তোমার সাথে ওযু করে নামায পড়ব।

৩) মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে স্রষ্টার কোনো দরকার নাই, মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে শূন্য থেকে।

মাইকেল : হাই আরিফ! পড়ন্ত বিকালে একাকী নদীর তীরে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে কী ভাবছিস?

আরিফ : আসসালামু আলা মানিত্তাবাউল হুদা। মহাবিশ্বের সৃষ্টি নিয়ে ভাবছি। দাদা আমাকে একটু বলেন তো মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে কীভাবে?

মাইকেল : সম্প্রতি বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে স্রষ্টার কোন দরকার নাই। মহাবিশ্ব শূন্য থেকেই সৃষ্টি হয়েছে।

প্রকৃতি শুন্যস্থান পছন্দ করে না। তাই, শুন্যস্থান পূরণ করতে আপনা আপনি কোয়াণ্টাম ফ্লাকচুয়েশন হয়ে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে।

আরিফ : যেখানে আপনি শুন্যস্থান নিয়ে কথা বলছেন, যখন সময় ছিল না, যখন সময় স্থান ছিল না তখন আপনি প্রকৃতি পেলেন?

শুন্য থেকেই মহাবিশ্ব সৃষ্টির কথা আল- কোরআন এ বলা আছে দাদা।

কোরআন যার কাছ থেকে এসেছে তিনিই তার সৃষ্টি জগতের সৃষ্টির ব্যখ্যা দিয়েছেন।

মাইকেল: কোরআন এ কী আছে বলো তো?

আরিফ : সূরা বাকারাহ এর ১১৭ নং আয়াত এ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "তিনি আসমান সমূহ ও যমীনের স্রষ্ঠা, আর যখন তিনি কোন বিষয় এর সিধান্ত নেন, তখন কেবল বলেন হও ফলে তা হয়ে যায় ""যিনি আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী কে অনঅস্তিত্ব হতে অস্তিত্ব এ আনায়ন করেন। (এখানে মূল শব্দ বাদ্যিয়ু সেখান থেকেই অস্তিত্ব অনঅস্ত্বিত্বের ধারণা। এবং যখন তিনি কিছু করবার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন শুধু বলেন হও আর তা হয়ে যায়"

Creator of the heavens and thr earth from nothingness . He has only to say when He wills a thing, "Be" and it is....

মাইকেল : আল্লাহ কী কোয়াণ্টাম ফ্লাকচুয়েশন এর কথাই বলছেন?

আরিফ : না দাদা, আল্লাহ তা'লা তাহার সৃষ্টির কথা বলছেন। তিনি অনস্তিত্ব (nothing)থেকে অস্তিত্বে (something) এনেছেন।

মাইকেল : কীভাবে তিনি অস্তিত্বে এনেছেন আমাকে একটু বুঝিয়ে বল তো?

আরিফ : আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আমি কেবল নির্দেশ দিয়েছি"। "না, এমনি হয় নি, (শূন্য হতে এমনি এমনি পৃথিবীর সৃষ্টি হয় নি)। আমি যখন নির্দেশ করেছি হও "(কুন), তখন তা হয়ে গেল"।

মাইকেল : আরিফ একটি উদাহরণ এর সাহায্যে এ বিষয়টা আমাকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দাও প্লিজ।

আরিফ : ধরুন একজন ম্যজিশিয়ান ম্যাজিক দেখাচ্ছে। ম্যাজিশিয়ান স্টেজ এর এক কোণে বসে আছে। কিন্তু সে তার চোখের ইশারায় ম্যাজিক দেখাচ্ছে। দর্শক দেখছে খালি টেবিলের উপরে হঠ্যাৎ একটা কবুতর তৈরি হয়ে গেল এবং তা উড়েও গেল।

দর্শক কী বলবে এটা কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে হয়ে গেছে, না বলবে না।

এর পিছনে ম্যাজিশিয়ান এর কারসাজি আছে। সে স্টেজের এক কোণ থেকে চোখ দিয়ে ইশারা করছে বলেই এটা হয়েছে।

স্রষ্টাও সেরকম। তিনি বলেছেন "হও" আর মহাবিশ্ব আপ্না আপনিই হয়ে গেল।

আপনাদের সেই শুন্যস্থান থেকে স্রষ্টার দূরত্ব কেবল অই "হও" পর্যন্তই।

মাগরিব এর আযান পড়তে শুরু করেছে দাদা। আজ তাহলে উঠি....

৪) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কী সত্যিই ৩ টা সূরাকে কুরআন এর অংশ বলে মানতেন না? (প্রথম পর্ব)

রাশেদ: হাই জাভেদ! কেমন আছিস? কী করছিলি এতক্ষণ?

জাভেদ: আলহামদুলিল্লাহ ভালো। কুরআন তেলওয়াত করছিলাম।

তুই কেমন আছিস?

রাশেদ: ভালো আছি। তোদের কুরআন এ কয়টা সূরা?

জাভেদ : ১১৪ টি। কেন?

রাশেদ : তাহলে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর মুসহাফে (লিপিবদ্ধ কুরআন) এ ১১১ টি সূরা ছিল কেন?

জাভেদ : এ বিষয় টা কীভাবে কোথা থেকে জেনেছ? কোন তিনটি সূরা বল তো?

রাশেদ:

"জালালুদ্দিন সুয়ুতির উলমুল কুরআন সম্পর্কিত বিখ্যাত গ্রন্থে আল ইকতান এ একটা রেওয়াত এ বলা হয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুর মুসহাফ এ তিনটি সূরা ছিল না। সূরা ফাতিহা ও মুয়াওয়ায়িযাতাইন (ফালাক ও নাস)। অর্থাৎ ১, ১১৩ ও ১১৪ নং সূরা।

জাভেদ: এ বিষয়ে প্রকৃত সত্য উন্মোচন এর জন্য সূরা ফাতিহা ও মুয়াওয়ায়িযাতাইন (ফালাক ও নাস) এর ব্যাপার এ উক্ত সাহাবীর অবস্থান পৃথক পৃথক ভাবে দলিল প্রমাণসহ বলছি। গভীর মনোযোগ দিয়ে শোন।

ইবনে জারির তাবারী (র) কে উদ্ধৃত করে জালালুদ্দিন সুয়ুতি (র:) বর্ণণা করেন যে, ইবনে মাসউদ রা. থেকে আল্লাহর বাণীর ব্যাপার এ বর্নিত আছে, "আমি তোমাকে [মুহাম্মদ (স)] সাতটি বারবার পঠিতব্য আয়াত এবং মহান কুরআন দিয়েছি।"" তিনি বলেন এ হচ্ছে ফাতিহাতুল কিতাব সূরা ফাতিহা "

রাশেদ : তুমি যে কথাগুলো বলছ তার উৎস কী?

জাভেদ : আস সূয়ূতি দূরর মানসূর ফি তফসির বিল মাসুর বেরুত দারুল ফিকির, ৫ম খন্ড,পৃষ্ঠা ৯৪"]

রাশেদ: সূরা ফাতিহা সম্পর্কে উনার ব্যাপারে ভ্রান্ত ধারণা আমার দূর হয়েছে।এবার সূরা ফালাক ও নাস সম্পর্কে তোর বক্তব্য কী

জাভেদ : মুয়াওয়িযাতাইন এর ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুর অবস্থান পৃথক পৃথকভাবে সংক্ষেপে বর্ণণা করছি।

এই সাহাবী যে সূরা ফালাক ও নাস কে কুরআন এর অংশ বলে মনে করতেন একথার পিছনে বেশ শক্তিশালী প্রমাণ রয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু থেকে বর্ণিত:

""দুইটি সূরা বেশি করে পড়ো আল্লাহ এর জন্য আখিরাতে তোমাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন। আর তারা হচ্ছে আল মুয়াওয়িযাতাইন (সূরা ফালাক ও নাস)।

রাশেদ: একথাগুলি তুই নিজ থেকেই বলছিস নাকি কোথাও লিখিত আছে?

জাভেদ : আলী আল মুত্তাকী, কানজুল উম্মাল, বেরুত-আর রিসালাহ পাবলিকেশন্স,১৯৮১, হাদীস নং ২৭৪৩

রাশেদ: তোর বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু এর ব্যাপারে এটি নাস্তিক ও ইসলাম বিদ্বেষীদের আনীত এই অপবাদ মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর।

জাভেদ : আলহামদুলিল্লাহ, তুই বুঝতে পারছিস। এশার আযান হচ্ছে চল মসজিদে গিয়ে নামায পড়ে আসি।

৫) সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কী সত্যিই ৩ টা সূরাকে কুরআন এর অংশ বলে মানতেন না? (দ্বিতীয় পর্ব)

আবির : জাবির কী পড়ছিস?

জাবির: ইসলামের ইতিহাস পড়ছি।

আবির : চল ছাদে যায়। তোর সাথে ইসলামের ইতিহাস নিয়ে আমার কিছু কথা আছে।

জাবির: চলেন ভাইয়া। কী কথা ভাইয়া?

আবির: কুরআন সংকলন ও সংরক্ষণকে প্রশ্নবিদ্ধ কারীরা (খ্রিস্টানমিশনারী, নাস্তিক মুক্তমনা ইসলাম বিদ্বেষী) যেসব অভিযোগ করে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর মাসহাফ (পূর্ণ কুরআন) এ ১১১ টি সূরা ছিল। এ বিষয়ে কয়েক টি বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য আছে। যা আমাকেও বিভ্রান্ত করছে।

জাবির : কী কী বিভ্রান্তি আমাকে বলেন ভাইয়া। আমি আমার জানাবোঝা থেকে এগুলোর অপোনেদন কোনর চেষ্টা করি।

আবির : আবদাহ এবং আসীম যির থেকে বর্ণণা করেছেন, তিনি বলেন, আমি উবাই (রা) কে বলেছি "আপনার ভাই ইবন মাসুদ (রা) সেগুলোকে (সূরা ফালাক ও নাস) তার মুসহাফ থেকে মুছে ফেলেছেন," এবং তিনি এতে কোন আপত্তি করলেন না"।

জাবির :"এই বর্ণণাটিতে দেখা যাচ্ছে, সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সূরাগুলো মুছে ফেলেছেন শুনেও কুরআন এর আলিম সাহাবী উবাই বিন কাব (রা) কোন আপ্তত্তি বা প্রতিবাদ করছেন না। অথচ ইসলামের একটা সুপ্রতিষ্ঠিত আকীদা হচ্ছে, কেউ যদি কুরআন এর একটি আয়াতও অস্বীকৃতি করে তাহলে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় এএবং কাফির হিসেবে পরিগণিত হয়। অতএব সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যদি আসলেই কুরআন এর সূরাদ্বয়কে মানতে অস্বীকার , তাহলে (রা) অবশ্যই কোন না কোন প্রতিক্রিয়া দেখাতেন।

এ থেকে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে উবাই (রা) বুঝতে পেরেছিলেন যে ইবন মাসুদ রাদিআল্লাহু সূরাদ্বয়কে কুরআন এর অংশ হিসেবে মানতে অস্বীকার করছেন না। শুধুমাত্র নিজ মুসহাফ এ উল্লেখ করেন নি মাত্র।

আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হচ্ছে, যে আসীম ও যির এই রেওয়ায়েত এর বর্ণণাকারী তারা স্বয়ং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুর এর সূত্রে বর্ণিত কিরাত থেকে সূরা ফালাক ও নাস পাঠ করেছেন।

আবির: আচ্ছা এই সাহাবী সম্পর্কে আমার এই জানাবোঝা টা যে ভুল ছিল তা এখন বুঝতে পারলাম।এখন তুমি আমার সংশয় এর কী ব্যাখ্যা দিবে?

জাবির: কি সংশয় বলেন ভাইয়া?

আবির : আব্দুর রহমান বিন ইয়াজিদ বর্ণ ণা করেছেন, ইবনে মাসুদ রাদিআল্লাহু মুওয়ায়িযাতাইন (সূরা ফালাক ও নাস) কে তার মুসহাফ থেকে মুছে ফেলেছেন এবং বলেছেন এগুলো কুরআনের অংশগ্রহণ নয়।"

একই বিবরণ ইমাম তাবারানী(র) এর মু'জামুল কাবীরেও এসেছে।

জাবির : এই বর্ণণা টি সত্য হতে পারে না। কেন না এটি একটি শাজ বা বিচ্ছিন্ন বর্ণণা। যা শুধুমাত্র আব্দুর রহমান বিন ইয়াজিদ বর্ণণা করেছেন। হাদিস শাস্ত্রে মুতওয়াতিরের বিপরীত এ বিচ্ছিন্ন বর্ণাণা দ্বারা কোন বিষয় প্রমাণিত হয় না। এমন কি এই বর্ণণার সনদ সহীহ হলেও। এক্ষেত্রে এক মুআল্লাল বা ত্রুটিপূর্ণ বর্ণণা বলে।

আবির: আপাতদৃষ্টিতে বুঝতে পেরেছি। তবে আরও কিছু দলিল প্রমাণ দাও।

জাবির: ঠিক আছে ভাইয়া। বিপরীত বর্ণণাগুলো সম্পর্কে উলামাগণের অভিমত কী তা আপনাকে বলছি। মমনোযোগ দিয়ে শোনেন।

ইমাম নব বী (র) বলেন, " এ ব্যাপার এ মুসলিমগণের ইজমা রয়েছে যে, মুয়ায়িযাতাইন ও সূরা ফাতিহা কুরআন এর অংশ। এবং যে তা অস্বীকার করে সে কাফির হয়ে

যায়। আর এব্যাপারে ইবনে মাসুদ রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু থেকে যা বর্ণিত আছে তা সহীহ নয়।

আবু হাফস ইবন আদিল আল হাম্বলী (র) লিখেছেন," ইবনে মাসুদ (রা) থেকে বর্ণিত এই হাদিস টি মিথ্যা বানোয়াট"।

আল খিফাজী (র) বলেন, "আর ইবন মাসুদ (রা) থেকে সূরা ফাতিহা ও মুওয়ায়িযাতাইন কুরআন এর অংশ নয় এ মর্মে যা বর্ণিত হয়েছে তার কোন।ভিত্তি নাই"।

এছাড়া ইমাম ইবন হজম(র) থেকেও অনূরুপ বর্ণিত হয়েছে"।

ইমাম সুয়ুতি (র) আবু বকর আল বাকিলানি (র) থেকে উধৃত করেছেন, এটা মোটেও তার {ইবন মাসুদ (র)} থেকে প্রমাণিত নয় যে, এই সূরাদ্বয় কুরআন এর নংশ নয়। কুরআন এর অংশ হিসেবে অস্বীকার করে তবে তার মুসহাফ থেকে মোছেন নি, বাদ দেন নি। তার নিকট বিষয় টি এরূপ ছিল যে। তিনি নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ ব্যতীত কিছুই লিখতেন না। এবং তিনি এ ব্যাপার এ কিছু লিখত পাননি বা নির্দেশ শোনেন নি।

আবির: দলিল প্রমাণসহ তোমার এ আলোচনা দ্বারা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হল যে, সংলাপ:

সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর বিরুদ্ধে তিনটি সূরাকে (সূরা ফাতিহা, ফালাক ও নাস) কুরআন এর অংশ হিসেবে না মানার যে অভিযোগ তোলা হয় তা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত। সম্মানিত এই সাহাবী অন্য সবার ন্যায় একই কোরআন তেলওয়াত করতেন।

জাবির : মা খাবার খেতে ডাকছেন, চলেন ভাই খেতে যাই।

৬)বিষয়: আল্লাহ যত নবী পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন,তাদেঁর মধ্যে একজনও কেন মহিলা নেই? পুরুষকে কেন নবী হিসাবে পাঠানো হয়েছে?

এলিন: হাই আবদুল্লাহ! কোথায় যাচ্ছিস?

আবদুল্লাহ:আসসালামু আলা মানিত্তাবাউল হুদা।

মা এর জন্যে নতুন হিজাব নিতে যাচ্ছি।

এলিন: তোদের ধর্মে নারীদের এতো সম্মান, তাহলে তোদের কোনো মহিলা নবী নেই কেনো?

আবদুল্লাহ: আলহামদুলিল্লাহ্। সাধারন মানুষের চাইতে নবীগনের বেশি সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় এবং তা সমাধান করতে হয়। যা একজন নারীর জন্যে চ্যালেঞ্জিং।

এলিন: কেমন চ্যালেঞ্জিং?

আবদুল্লাহ: নবীকে অনেক মানুষের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে যা নারী নবীর ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

এলিন: নবী ইমামতি করেছে নারী নবী ইমামতি করলে কি সমস্যা?

আবদুল্লাহ: যেমন - নবীকে নামাযে ইমামতি করতে হবে যদি মহিলা ইমাম হয় আর পুরুষরা পেছনে থাকে তাহলেই আল্লাহর দিকে মনযোগের চাইতে উক্ত মহিলার দিকে মনযোগ বেশি যাবে। বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান সেটাই প্রমান করে।

এলিন: সে মানলাম। কিন্তু তোরা মুসলিমরা কি মেয়েদের এতোই দুর্বল ও অদক্ষ মনে করিস যে তোদের নবীদের মতো তারা অন্যদের দাওয়াহ দিতে পারতো না?

আবদুল্লাহ: পয়গম্বরকে মানুষের সাথে মেলামেশা করতে হয়। হাত মেলাতে হয় যা শরীয়া অনুযায়ী নারী নবীর ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, একজন পুরুষ নবী সহজে করতে পারে।

এছাড়া নারীগনকে বাচ্চা ১০ মাস ১০দিন গর্ভে ধারন করতে হয়। সংসার ছেলে-মেয়ে দেখাশুনা করতে হয় তার উপর যদি নবীর দায়িত্ব এলে তাহলে তা অবিচার হয়ে যায়।

এলিন: তাহলে কি এটা ন্যায়বিচার করা হলো?

আবদুল্লাহ: আল্লাহ বলেন-‘‘আমি ন্যায়বিচারক ও দয়ালু"

আল্লাহ নারীগনকে পবিত্র কুরআন অনেক সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। কুরআনে বলা হয়েছে বিবি মারিয়ম (আঃ) তিনি সমস্ত পৃথিবীর নারীশ্রেষ্ঠা, হযরত আয়েশা হযরত ফাতেমার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহতাআলা দায়িত্বের সমবন্টন করার ক্ষেত্রেই নারীগনকে নবী হিসেবে দুনিয়াতে পাঠাননি।

আল্লাহ্ সবচেয়ে ভালো জানেন। আশা করি আপনার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পেয়েছেন।

এলিন: ঠিক আছে এখন কাজে যাচ্ছি। পরে কথা হবে ।

৬) বিষয়: যদি আল্লাহর ইচ্ছাই সব হয়ে থাকে তাহলে নিজের ইচ্ছা বলতে কি কিছুই নেই?

অর্থন: হাই হাসান! শুনলাম তোমার নাকি আরেকটা মেয়ে হয়েছে?

হাসান: সবই আল্লাহর ইচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ।

অর্থন: এই যে বললে সবই আল্লাহর ইচ্ছে, যদি আল্লাহর ইচ্ছাই সব হয়ে থাকে তাহলে নিজের ইচ্ছা বলতে কি কিছুই নেই?

হাসান: আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহর ইচ্ছেতেই সব হয়ে থাকে। আল্লাহ বলেন

একমাত্র তারই হুকুম চলে এবং তোমরা সবাই তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে’ (সূরা কাসাস : আয়াত-৭০)

এছাড়াও তিনি বলেন

‘‘তোমরা আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছার বাইরে কিছুই ইচ্ছা করতে পারো না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সুবিজ্ঞ’’। (সূরা দাহার: ৩১)

অর্থন: তাহলে কি নিজের ইচ্ছের কোনো মূল্য নেই ? যারা চুরি ডাকাতি অন্যায় করে তাহলে তারা কেনো শাস্তি পাবে সেসব তো আল্লাহর ইচ্ছেতেই হচ্ছে।

হাসান: আমৃত্যু স্বাধীন ইচ্ছা,একটা পরীক্ষা-তবে প্রত্যেকেরই নিজস্ব ইচ্ছা আছে উদাহরন দ্বারা বলা যায়।

ধরুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে আপনার বাড়ি তথা প্রত্যেক এলাকার বিদ্যুৎ আসে। যদি কেউ নিজের আঙ্গুল কারেন্টের লাইনে রাখে সে ধাক্কা খাবে।

এটা তার দোষ, আল্লাহ তার ইচ্ছেকে স্বাধীন করে দিয়েছেন সে ইচ্ছে করলে বিদ্যুৎ হাত দেবে আর ইচ্ছা না করলে দেবেনা।

কিন্তু তার জন্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে দায়ী করা যাবেনা সুতরাং দোষটা পড়ে সসম্পূর্ণরূপে মানুষের- কেন সে বিদ্যুৎ এ হাত দিলো?

আল্লাহ তার ইচ্ছেকে স্বাধীন করে দিয়েছেন কারন প্রত্যেকের স্বাধীন ইচ্ছা এক একটা পরীক্ষা।

অর্থন: হুম বুঝলাম। ।

বিষয়: ইসলাম আকার বা মূর্তি পূজাকে প্রত্যাখ্যান করে কিন্তু তারা নিজেরাই কেন প্রার্থনায় কাবার প্রতি নত হয়ে তার উপাসনা করে?

রবিন: হ্যালো মুহাম্মাদ! তুই কি হিন্দুদের পূজা দেখতে গিয়েছিলি নাকি?

মুহাম্মাদ: আস্তাগফিরুল্লাহ!! আমি হিন্দুদের পুজো তে যাবো কেনো! মূর্তি পূজা ইসলামে হারাম।

রবিন: হাস্যকর কথা বললি!!ইসলাম আকার বা মূর্তি পূজাকে প্রত্যাখ্যান করে কিন্তু তোরা নিজেরাই কেন প্রার্থনায় কাবার প্রতি নত হয়ে তার উপাসনা করিস?

মুহাম্মাদ: আলহামদু লিল্লাহ।

কা'বা মুসলিমদের 'কেবলা'। মুসলিমরা তাদের প্রার্থনায় দিক নির্দেশক হিসেবে গণ্য করে। এখানে লক্ষ্য করার মতো বিষয় হলো, মুসলিমরা তাদের প্রার্থনায় কা'বার দিকে

মুখ করে বটে তবে তারা কাবা ঘরের উপাসনা করে না। উপাসনা করে সেই ঘরের মালিক অদৃশ্য আল্লাহ তা'আলার।

রবিন: এই দিক কি তোরা নিজেরা নির্দিষ্ট করে নিয়েছিস?

মুহাম্মাদ: জ্যোতীর্ময় কুরআনে বলা হয়েছেঃ-

"তোমার (নির্দেশনার জন্য) বার বার আকাশের দিকে করে তাকানো আমরা দেখেছি। এখন আমরা কি তোমাকে ঘুরিয়ে দেব সেই কেবলার দিকে যা তোমাকে সন্তুষ্ট করবে? তাহলে ঘুরিয়ে নাও তোমরা থাকনা কেন (নামাযে) তার দিকেই মুখ ফিরিয়ে নেবে।" (2:144)

রবিন: নামাজ পড়িস বুঝলাম কিন্তু কা'বা কে উদ্দেশ্য করে তোরা তাওয়াফ করিস কেনো?

মুহাম্মাদ: কা'বাকে ঘিরে তওয়াফ করা আল্লাহর একত্বের নির্দেশক মুসলিমরা কা'বা যেয়ারতে মক্কায় গেলে 'তাওয়াফ' করে।

অর্থাৎ কা'বা ঘরকে কেন্দ্র করে চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে। কাজটি এক আল্লাহ বিশ্বাস ও উপাসনার নিদর্শন। প্রতিটি বৃত্ত গোলাকার এবং তার একটিই কেন্দ্র বিন্দু থাকে। কাজেই উপাসনার যোগ্য আল্লাহ-মাত্র একজনই, এটা তারই অন্যতম নিদর্শণ।

রবিন: আর তোরা যে ওই একটা কালো পাথরে চুমু দিস! সেটা কি পাথর পুজো নয়??

মুহাম্মাদ: হযরত উমর রাঃ এর হাদীস হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর সম্পর্কিত হযরত উমর রাঃ এর একটি বিখ্যাত উক্তি রয়েছে। হাদীসে শাস্ত্র অনুযায়ী যাকে 'আছার' বা ঐতিহ্য বলা যায়। বুখারী শরীফের হজ্জ সম্পর্কিত ৩৫৬ অধ্যায়ে ৬৭৫ নং হাদীসে, উমর রাঃ বলেছেন-

"আমি জানি তুমি একটি পাথরখন্ড মাত্র এবং না কোনো উপকার করতে সক্ষম না কোনো ক্ষতি। আমি যদি না দেখতাম খোদ আল্লাহর রাসূল (صلى الله عليه و سلم) তোমাকে স্পর্শ করেছেন তা হলে কস্মিন কালেও আমি তোমাকে স্পর্শ করতাম না।"

রবিন: তাহলে তুই কি বলতে চাচ্ছিস যে কাবা ঘর কে তোরা পুজো করিস না ?

মুহাম্মাদ: মানুষ কা'বা ঘরের ওপরে উঠে আযান দিয়েছিল রাসূলুল্লাহ (صلى الله عليه و سلم) এর সময়ে লোকেরা কা'বা ঘরের ওপরে উঠে আযান দিত। মুসলিমরা কা'বা ঘরের উপাসনা করে বলে যে তোর মনে হয়, এখন তুই ই বল কোন মুর্তি-পূজারী, যে মুর্তি সে পূজা করে, তার মাথার ওপরে উঠে দাঁড়ায়? বাকিটা তুই নিজেই বুঝে নে!

রবিন: হুমম বুঝলাম। এখন কাজের চাপ আছে, পরে কথা হবে।

৭) বিষয়: -মুসলিমগন কুরআনের আয়াত রহিতকরন বিস্বাস করেন তার মানে-সুষ্টিকর্তা ভুল করেছেন ও পরবর্তীতে সংশোধন করেছেন?

ঋত্বিক: কিরে আহমাদ! কোথায় যাচ্ছিস?

আহমাদ: এইতো কুরআন শিখতে যাচ্ছি শায়খের কাছে।

ঋত্বিক: আচ্ছা তুই কি বিশ্বাস করিস কুরআনের রহিতকরনে?

আহমাদ: আলহামদুলিল্লাহ। আমি বিশ্বাস করি।

ঋত্বিক: তার মানে কি তোদের স্রষ্টা ভুল করেছেন ও পরবর্তীতে সংশোধন করেছেন?

আহমাদ: আল্লাহ বলেন –

"আমি কোন আয়াত বা প্রকাশ রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি।" সুরা বাকারা-২, আয়াত-১০৬

আয়াতের অর্থ নিদর্শন এবং প্রকাশ। এই আয়াত দুভাবে বিশ্লেষন করা যায়-

১) প্রকাশ রহিত করা মানে পূর্ববর্তী যেসব কিতাব এসেছিল যেমন তাওরাত, যবুর ,ইঞ্জিল ইত্যাদিও চাইতেও তিনি উত্তম প্রকাশ অবর্তীন করি।

২) একে কুরানের আয়াত হিসাবে নিলে বোঝা যায় কোন আয়াত আল্লাহ রহিত করে এর পরিবর্তে তদপেক্ষা উত্তম আয়াত অবর্তীন করেন। দুটোই সঠিক।

ঋত্বিক: তাহলে তো মনে হয় অন্য আয়াতের সাথে এই আয়াতের গড়মিল আছে মনে হচ্ছে।

আহমাদ : দ্বিতীয় বিশ্লেষনকে তোর মতো অনেকে ভুল বোঝে

অনেকে মনে করেন অন্য আয়াতের সাথে এই আয়াতের গরমিল আছে। আল্লাহপাক বলেন কুরআনে –

“তারা কি বলে? কোরআন তুমি তৈরী করেছ? তুমি বল, তবে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা তৈরী করে নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পার ডেকে নাও, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়ে থাকে।” সুরা হুদ আয়াত-১৩

তারা এ দশ আয়াত রচনা করতে অপরাগতা প্রকাশ করলো। তারপর তিনি বলেন যদি তোমাদের ক্ষমতা থাকে তবে একটি-

”মানুষ কি বলে যে, এটি বানিয়ে এনেছ? বলে দাও, তোমরা নিয়ে এসো একটিই সূরা, আর ডেকে নাও, যাদেরকে নিতে সক্ষম হও আল্লাহ ব্যতীত, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।”

এরপর তিনি ফাইনাল চ্যালেঞ্জ দেন এরমতো কাছাকাছি (মিমমিছলিহি) একটি সুরা নিয়ে এস-

”এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকে সঙ্গে নাও-এক আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।”

তারমানে এটার মধ্যে মতদৈততা নেই।

ঋত্বিক: যেমন?

আহমাদ: মতদৈততা হলো দুটো ব্যাপার যেখানে একসাথে ঘটা সম্ভব নয়। যেমন আমি বললাম সে ক্লাস ১০ পাশ করতে পারবেনা এরপর আমি বললাম তুমি এমনকি ৫ম শ্রেনী পাশ করতে পারবেনা এরপর আমি বললাম তোমার ব্রেন এত খারাপ তুমি কেজি পাশ করতে পারবেনা। আমার উপরোক্ত বর্ননা চারটাই সত্যি ও কোন ভিন্নমত নেই।

ঋত্বিক: তাহলে মদের বিষয়ে যে ভিন্ন ভিন্ন নিষেধাজ্ঞা এসেছে সেই বিষয়ে তুই কি বলবি?

আহমাদ: মদের ব্যপারেও তিন স্তরে নিষিদ্ধতা এসেছে। একই সাথে নিষেধ হয়নি। যেমন আমি বললাম আমি বরিশালে থাকিনা এরপর বললাম আমি ঢাকায় থাকিনা এরপর বললাম জামালপুর থাকিনা আমার এই তিন বক্তব্য কোন মতদৈততা নেই উপরন্তু তথ্যবহুল।

আল্লাহ্ সবচেয়ে ভালো জানেন।

ঋত্বিক: এসব উত্তর কই থেকে শিখেছিস? তোদের কাছে যুক্তির কোনো শেষ নেই।

আহমাদ: আল্লাহ সব প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিয়েছেন, আমাদের কাছে যুক্তি নয় বরং প্রমাণ রয়েছে- আল কোরআন।

ঋত্বিক: হুমম, ওকে বাই।

৮) যদি আল্লাহ কাফেরদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেন তবে তাদের কেন দোষী সাবস্ত্য করা হয়?

রক্তিম: হ্যালো উসমান! কেমন আছিস?

উসমান: আল্লাহর রহমতে ভালো আছি, আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কেমন আছেন?

রক্তিম: ভালো আছি। আল্লাহ একটা প্রশ্নের উত্তর দে ত

যদি আল্লাহ কাফেরদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেন তবে তাদের কেন দোষী সাবস্ত্য করা হয়?

উসমান: আল্লাহ বলেন –

“আল্লাহ্ তাদের অন্তকরণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।” সুরা বাকারা-২, আয়াত-৭

রক্তিম: এখানে তাদের দোষ টা কোথায়?

উসমান: আল্লাহ কাফেরদের হটকারিতার জন্য এই উক্তি করেছেন। তাদের কর্মের জন্য এমন দশা হয়েছে। তারমানে এই নয় যে তাদের কর্মফলের জন্য আল্লাহ দোষী।

রক্তিম: তাহলে কি তারা নিজেরাই অপরাধী?

উসমান: অপরাধী তারা নিজেই উদাহরন স্বরুপ একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক ভবিষ্যৎবানী করলেন কিছু ছাত্র ফেল করবে যেহেতু তারা সঠিক মতো লেখাপড়া ও রুটিন অনুসরন করেনি।

যদি ছাত্রগুলো ফেল করে আপনি কাকে দোষ দেবেন ছাত্রকে নাকি শিক্ষককে? দোষ ছাত্ররই।

একইভাবে আল্লাহ তাদের অন্তরে সিল মেরে দিয়েছেন কারন তারা ছিল অবাধ্য এই অবাধ্যতার দরুন তারা বিপথে চলে গেছে।

আল্লাহ্ সবচেয়ে ভালো জানেন।

রক্তিম: খুব সহজভাবে বুঝিয়ে বললি। থ্যাংক ইউ।

৯) ইসলাম কি বহু খোদায় বিস্বাস করে কারন অনেক স্থানে আমি-র পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করা হয়েছে?

জোহান: হাই জুবায়ের! কেমন আছিস?

জুবায়ের: আলহামদুলিল্লহ, আল্লাহ ভালো রেখেছেন।

জোহান: কয়জন আল্লাহ মিলে ভালো রেখেছেন তোকে?

জুবায়ের: আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

জোহান: তোরা কি বহু খোদায় বিশ্বাসী?

জুবায়ের: আস্তাগফিরুল্লাহ! আমাদের সৃষ্টিকর্তা কেবল একজন। তার কোনো শরিক নেই।

জোহান: তাহলে কুরআনের বহু স্থানে অনেক স্থানে আমি-র পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করা হয়েছে?

জুবায়ের: বহু ভাষায় দু'ধরনের বহুবচন আছে-

ইসলাম এক সৃষ্টিকর্তায় বিস্বাসী। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ নিজেই পবিত্র কুরআনে আমরা শব্দটি ব্যবহার করেছেন তারমানে এই নয় তিনি বহু। ভাষায় দু'ধরনের বহুবচন আছে একটি হল পরিমান বোঝাতে আরেকটি হল সম্মানার্থে।

ইংরেজিতে ইংল্যান্ডের রানীকে আমরা বলে সম্মানার্থে সম্বোধন করা হয়। যা রাজকীয় মর্যাদা। ইন্ডিয়াতেও রাজিব গান্ধি বলেন-'হাম দেখনা চাতেহে' এখানে হাম মানে আমরা এটি সম্মানার্থে ব্যবহার হয়েছে। একইভাবে আরবীতে 'নাহনু' শব্দটি মর্যাদা অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে।

ইসলাম এক সৃষ্টিকর্তায় বিস্বাসী-

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :-

"কুল হুয়াল্লাহু আহাদ" ।অর্থাৎ তিনি এক ও অদ্বিতীয়। সুরা ইখলাস-১১২,আয়াত-১

জোহান: ওহ আচ্ছা। এটা তো এতদিন জানতাম ই না।

ইসলাম ধর্ম নিয়ে আরো জানার চেষ্টা করবো।

জুবায়ের: যেকোনো জিজ্ঞাসা থাকলে আমাকে জানাবেন ইন শা আল্লাহ্।

১০) আল্লাহকে প্রশংসা করা কি প্রয়োজন? না করলে তিনি কেন আমাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন তবে তিনি কি করে রহিম হলেন?

ফ্রেডি: হ্যালো হামজা! কেমন আছিস?

হামজা: আলহামদুলিল্লাহ ভালো।

ফ্রেডি: আলহামদুলিল্লাহ অর্থ কি?

হামজা: সকল প্রশংসা আল্লাহর। তিনি তো রহমানুর রহিম।

ফ্রেডি: আল্লাহকে প্রশংসা করা কি প্রয়োজন? না করলে তিনি কেন আমাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন তবে তিনি কি করে রহিম হলেন?

হামজা: আলহামদুলিল্লাহ্।

আল্লাহ অল-রেডিই মহান-

ধরুন কেউ বললো আল্লাহু আকবার বা আল্লাহ মহান তার মানে এই নয় আল্লাহ তার প্রশংসার কারনে আরো মহান হয়ে গেলেন আল্লাহ অলরেডিই মহান যতই তাকে প্রশংসা করা হোক বা না হোক তিনি মহামহিম আছেন ছিলেন ও থাকবেন। আপনি তারঁ সমুদয় লাভের জন্য প্রশংসা করছেন না। আল্লাহ বলেন –

“হে মানুষ, তোমরা আল্লাহ্র গলগ্রহ। আর আল্লাহ্; তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।” সুরা ফাতির-৩৫, আয়াত-১৫

ফ্রেডি: তবে তার প্রশংসা করা উচিত কেনো?

হামজা: তারঁ প্রশংসা করা প্রয়োজন আমাদের লাভের জন্য-

আল্লাহ সমস্ত চাওয়া-পাওয়া থেকে মুক্ত। তারঁ প্রশংসা করা প্রয়োজন আমাদের লাভের জন্য। আপনি এমন কারো সম্মান করবেন যে সর্বজ্ঞ, অত্যন্ত সুক্ষদর্শী ও সব কিছু যার আয়ত্বাধীন, তারঁ প্রশংসা করে আপনি নিজেকে সন্তুষ্ট করবেন। এজন্যই প্রত্যেক মুসলিম প্রতি নামাযের শুরুই করে তাকে মর্যাদাসূচক উক্তি করে।

ফ্রেডি: কতক্ষণ প্রসংশা করতে হবে?

হামজা:

আপনি আল্লাহর প্রশংসা যতই করেন তা শেষ হবার নয়-

মুসলিমগন তার প্রশংসা করে নিজেকে পরিতুষ্ট করেন যে তিনিই একমাত্র সাহায্যকারী ও পরিত্রানকারী। ধরুন আপনি হার্টের রোগি, আপনার অসুস্থতার উপশমের জন্য আপনি কি রাস্তার যে কারো থেকে উপদেশ নিবেন নাকি যে হার্টের উপর খুব বিখ্যাত স্পেশালিষ্ট তার কাছ থেকে নিবেন আপাত দৃষ্টিতে তার কাছ থেকেই উপদেশ নিবেন যিনি এ ব্যপারে অভিজ্ঞ।

অতএব আল্লাহর প্রশংসা আমাদের নিজেদের উপকার ও স্বাথের জন্য। আপনি যতই আল্লাহর প্রশংসা করেন তা শেষ হবার নয় কারন আল্লাহ বলেন-

“হে মুহাম্মাদ! বলো, যদি আমার রবের কথা লেখার জন্য সমুদ্র কালিতে পরিণত হয় তাহলে সেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে কিন্তু আমার রবের কথা শেষ হবে না। বরং যদি এ পরিমাণ কালি আবারও আনি তাহলে তাও যথেষ্ট হবে না। ” সুরা কাহাফ-১৮, আয়াত-১০৯

আরও বলা হয়েছে –

“পৃথিবীতে যত গাছ আছে তা সবই যদি কলম হয়ে যায় এবং সমুদ্র (দোয়াত হয়ে যায়) , তাকে আরো সাতটি সমুদ্র কালি সরবরাহ করে তবুও আল্লাহর কথা (লেখা) শেষ হবে না। অবশ্যই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও জ্ঞানী। সুরা লুকমান-৩১, আয়াত-২৭

আল্লাহ আপনার ইবাদতের মুখাপেক্ষী নন। আপনি যতই প্রশংসা করেন তা শেষ হবেনা। এবং তা করবেন আপনার জন্য।

আল্লাহ্ সবচেয়ে ভালো জানেন।

ফ্রেডি: এমন যদি স্রষ্টা হোন, তবে সত্যিই তিনিই সবচেয়ে বেশি প্রশংসার হকদার।

১১)বিজ্ঞান আমাদের বলে, যে যা খায় তার আচরণে তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। তাহলে ইসলাম কেন মুসলিমদেরকে আমিষ খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দেয়। যেখানে পশুর মাংস ব্যক্তিকে হিংস্র ও দুঃসাহসী করে তুলতে পারে?

অভ্র: হাই মাহাদী! কেমন আছিস?

মাহাদি: এইতো ভাই একটু কলেজের দিকে যাচ্ছি। আজ আমাদের পিকনিক আছে।

অভ্র: তাই নাকি! তা কি কি আইটেম আছে?

মাহাদী: মুরগির রোস্ট, গরুর গোশত, খাসি সব।

অভ্র: একটা কথা বলো তো, বিজ্ঞান আমাদের বলে, যে যা খায় তার আচরণে তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। তাহলে ইসলাম কেন মুসলিমদেরকে আমিষ খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দেয়।যেখানে পশুর মাংস ব্যক্তিকে হিংস্র ও দুঃসাহসী করে তুলতে পারে?

মাহাদী:আলহামদু লিল্লাহ।

ক. পশুর মধ্যে শুধু তৃনভোজী পশু খাওয়া অনুমোদিত

এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ একমত যে, ব্যক্তি যা আহার করে তার প্রতিক্রিয়া তার আচরণে প্রকাশ পায়। বাঘ, সিংহ, নেকড়ে ইত্যাদি হিংস্র মাংসাশী প্রাণী খাওয়া ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে- এটা তার অন্যতম একটি কারণ। এ ধরনের হিংস্র হয়ে উঠতে পারে। সে কারণে ইসলাম শুধু মাত্র গরু, মহিশ, ছাগল, ভেড়ার মতো শান্ত ও খুব সহজে পোষমানা প্রাণীর মাংস খেতে অনুমতি দেয়। বস্তুত এ কারণেই মুসলিমরা শান্তিকামী-শান্তিপ্রিয়।

অভ্র: এই বিষয়ে তোমাদের কুরআনে কি কিছু বলা হয়েছে?

মাহাদী: জ্বি ভাই।

জ্যোতির্ময় কুরআন বলছে- যা কিছু মন্দ রাসূল তা নিষিদ্ধ করেছেন- ”রাসূল তাদেরকে ভালো কাজ করতে আদেশ করেন। আর নিষেধ করেন যাবতীয় মন্দ থেকে এবং তিনি তাদের জন্য হালাল করেছেন যা কিছূ ভাল, পবিত্র, পরিচ্ছন্ন। আর হারাম করেছেন যা কিছু মন্দ অপরিচ্ছন্ন অপবিত্র। ” (সুরা আরাফ-৭: ১৫৭)

”রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দেন তা তোমরা গ্রহণ করো। আর যে সব থেকে নিষেধ করেন সে সব থেকে বিরত থাকো। ” (সুরা হাশর-৫৯ : ৭) একজন মুসলিমের জন্য তাদের রাসূলের এই বার্তার যথেষ্ট যে, আল্লাহ চান না মানুষ এমন কোনো ধরনের মাংস খায়- যেখানে অন্য কিছু ধরনকে (শান্ত-শিষ্ট পশুকে আহারের) অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

অভ্র: কি কি প্রাণী তবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং কেনো?

মাহাদী: মাংসাশী প্রাণী খাবার ব্যাপারে রাসূল (صلى الله عليه و سلم)-এর বাণী সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত বেশ কিছু সর্বসম্মত শুদ্ধ হাদীসের মধ্যে ইবনে আব্বাস রাঃ বর্ণিত মুলিম শরীফের ‘শিকার ও জবাই’ অধ্যায়ের ৪৭৫ নং হাদীসে, সুনানে ইবনে মাজাহর ১৩ অধ্যায়ের ৩২৩২ থেকে ৩২৩৪ হাদীস সমূহ উল্লেখযোগ্য। রাসূল (صلى الله عليه و سلم) খেতে নিষেধ করেছেনঃ

১.তীক্ষ্ণ ধারালো দাঁতওয়ালা হিংস্র জন্তু। অর্থাৎ মাংসাশী বন্য পশু প্রধানত বেড়াল ও কুকুর জাতীয় বাঘ, সিংহ, বেড়াল এবং শেয়াল, কুকুর, নেকড়ে, হায়না ইত্যাদি।

২. তীক্ষ্ণ দন্ডের অন্যান্য প্রাণী যেমন ইঁদুর, ন্যাংটি ইদুর, ছুঁচো ও ধারালো নখওয়ালা খরগোশ ইত্যাদি।

৩. সরিশ্রীপ জাতীয় অন্যান্য প্রাণী যেমন সাপ কুমীর ইত্যাদি।

৪. ধারালো ঠোঁট ও নখরওয়ালা শিকারী পাখি যেমন চিল, শুকুন, কাক, পেচাঁ ইত্যাদি। সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করতে পারে এমন কোনো বৈজ্ঞানীক দলিল নেই যে, আমিষ খাদ্য গ্রহণের ফলে মানুষ উগ্র ও হিংস্র হয়ে উঠতে পারে।

অভ্র: আচ্ছা বুঝলাম। আজ উঠি তবে।

১২) আল-কুরআন সংকলন করা হয়েছে তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ) এর আমলে তাহলে তা কিভাবে আল্লাহর আয়াত বলা যায়?

রিশি: হাই জাবির! কেমন আছিস?

জাবির: আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি।

রিশি: জাবির তোমার থেকে একটা বিষয় জানার ছিলো ।

জাবির : জ্বি বলুন।

রিশি: আল-কুরআন সংকলন করা হয়েছে তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ) এর আমলে তাহলে তা কিভাবে আল্লাহর আয়াত বলা যায়?

জাবির:আলহামদুলিল্লাহ্।

আয়াত বা সূরা নাযিলের পরপর সাহাবাদের মুখস্ত করতে ও লিখে রাখতে নির্দেশ দেয়া হত:-

এটা বলা ভুল যে হযরত ওসমান (রাঃ) কুরআন সংকলন করেছেন প্রকৃতপক্ষে রাসুল (ﷺ)-এর জীবিতকালে কুরআন সংকলন ও সংরক্ষিত হয়েছিল। যখন কোন আয়াত রাসুল (ﷺ) এর প্রতি নাযিল হতো তিনি অনতিবিলম্বে তা মুখস্ত করে নিতেন এবং সাহাবাদের শোনাতেন এবং তাদেঁর মুখস্ত করতে ও লিখে রাখতে নির্দেশ দিতেন,এবং তিনি সাহাবাদের পড়িয়ে শোনাতে বলতেন শুদ্ধতা যাচাই করতেন অর্থাৎ সাহাবীদের স্মরন শক্তি পরীক্ষা করে দেখতেন ।

তিনি সাহাবাদের সুরার ধারাবাহিকতা বলে রাখতেন ,যেমন-প্রথম যে সুরা নাযিল হয়েছে সুরা ইকরা যা পবিত্র কুরআনে ৯৬নং সূরা যা তিনি জীবরঈল (আঃ) এর মাধ্যমে জানতে পেরেছেন । বর্তমানে যে পর্যায় ক্রমিক সূরায় কুরআন সংকলিত আছে তার অনুরূপ 'লাওহে মাহফুজে' লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রতি রমজানে রাসুল(ﷺ) জীবরাঈল (আঃ) দ্বারা পুনরাবৃত্তি করতেন । তাঁর মৃত্যুকালীন বছরে রমজানের সময় তিনি দুবার পুনরাবৃত্তি করছিলেন।

রিশি: তাহলে কুরআন একত্রীকরণ করা হয়েছিল কিভাবে?

জাবির: কুরআন সংরক্ষিত হয়েছিল বিভিন্ন আঙ্গিকে-গাছের বাকলে,চমড়ায় ,উটের সেডলে ,সমতল পাথরে,গাছের পাতায়। ১ম খলীফা আবু বকর (রাঃ) এর খিলাফত কালে ইয়ামামার যুদ্ধে বহু কুরআনে হাফেজ শহীদ হন। হযরত আবু বকর (রাঃ)ও ওমর (রাঃ) সাহা

বীগনের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে যয়িদ-বিন-সাবিদ(রাঃ)-কে কুরআন সংকলনের জন্য দায়িত্ব প্রদান করেন। সব সাহাবীদের একসাথে করে যয়িদ-বিন-সাবিদ (রাঃ) সব কুরআনের আয়াতকে একসাথে করেন। এরপর তা দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) এর তত্তাবধানে আসলে তাঁর হাত হতে হযরত হাফসা (রাঃ) এর নিকট পৌঁছায়।

হযরত ওসমান (রাঃ) খিলাফতকাল-

তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রাঃ) এর সময় ইসলাম যখন প্রসার লাভ করছিল । বিভিন্ন স্থানের মধ্যে উচ্চারনগত সমস্যা দেখা দেয়ায় তিনি বিভিন্ন দেশের কুরআন হাফেজ এবং সংকলকদেরকে ডেকে পাঠান

ও হযরত হাফসা (রাঃ) এর নিকট হতে সংরক্ষিত কুরআন লিখে রাখতে বলেন ও তা সম্প্রচার করতে বলেন আর বাকী কুরআন তিনি পুড়িয়ে ফেলতে নির্দেশ দেন, কারন সব সাহাবীদের পক্ষে সমস্ত কুরআনের আয়াত সংরক্ষিত ছিলনা কারো কাছে ছিল ৫০০ আয়াত বা তার কম বা বেশি। পূর্বের কুরআনে হুবহু তুর্কির ফাত্তাকি যাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে ।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন সূরা হিজর-১৫,আয়াত-৯-

“আমরা কুরআন অবতীর্ন করেছি এবং আমরাই এর সংরক্ষনকারী।”

রিশি: ধন্যবাদ। আমি তাহলে এতদিন ভুল জানতাম।

১৩) ইসলাম একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয় কেন?অথবা ইসলামে বহু-বিবাহ অনুমোদিত কেন?

উদয়: হ্যালো আবিদ! কোথায় যাচ্ছিস এভাবে প্রস্তুতি নিয়ে?

আবিদ: দ্বিতীয় বিবাহের জন্যে কনে দেখতে যাচ্ছি।

উদয়: তুই তো অলরেডি বিবাহিত। ইসলাম একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয় কেন?

আবিদ: বহু-বিবাহের সংজ্ঞা 'বহু-বিবাহ' মানে এমন একটি বিবাহ পদ্ধতি যেখানে এক ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী থাকে। বহু-বিবাহ দুই ধরনের- একজন পুরুষ একাধিক নারীকে বিবাহ করে। আর একটি 'বহু স্বামীবরণ'।

অর্থাৎ একজন স্ত্রীলোক একাধিক পুরুষ বিবাহ করে। ইসলামে পুরুষের জন্য সীমিত সংখ্যক 'বহু-বিবাহ' অনুমোদিত। অপর দিকে নারীর জন্য একাধিক পুরুষ বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ 'হারাম'।

উদয়: আমার মূল প্রশ্ন ইসলামে কেনো একজন পুরুষ একাধিক বিয়ে করার অনুমতি পায়?

আবিদ: পৃথিবীতে কুরআ'নই একমাত্র ধর্ম-গ্রন্থ, যে বলে "বিবাহ করো মাত্র একজনকে" ভূ-পৃষ্টের ওপরে কুরআনই একমাত্র ধর্ম-গ্রন্থ যা এই বাক্যাংশ ধারণ করে আছে-"বিবাহ করো মাত্র একজনকে" আর কোনো ধর্ম-গ্রন্থ নেই, যা পুরুষকে নির্দেশ একজন স্ত্রীতে সন্তুষ্ট থাকতে।

অন্য কোনো ধর্ম-গ্রন্থ -হোক তা বেদ, রামায়ন, মহাভারত, গীতা, অন্যদিকে তালমুদ অথবা বাইবেল। এ সবের মধ্যে স্ত্রীদের সংখ্যার ওপর কোনো বিধিনিষেধ বের করতে পারবে কি কেউ? বরং এসব ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী একজন পুরুষ বিবাহ করতে পারে যতজন তার ইচ্ছা।

উদয়: অন্য ধর্মেও একাধিক স্ত্রী রাখতে বলা হয়েছে?

আবিদ: এটা অনেক পরের কথা যে, হিন্দু ধর্ম গুরু এবং খ্রীস্টান চার্চ স্ত্রীর সংখ্যা ‘এক’ এ নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছে।

বাইবেল যেহেতু স্ত্রীদের সংখ্যার ওপর কোনো বিধিনিষেধই নেই। সেহেতু আগের কালের খ্রীস্টান পুরুষরা যে-ক’জন খুশি স্ত্রী রাখতে পারত।অসংখ্য ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব তাদের ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী একাধিক স্ত্রী রেখেছে। যেমন রামের পিতা রাজা দশরথ। ভগবান শ্রী কৃষ্ণের তো অনেক স্ত্রী ছিল!

বাইবেল যেহেতু স্ত্রীদের সংখ্যার ওপর কোনো বিধিনিষেধই নেই। সেহেতু আগের কালের খ্রীস্টান পুরুষরা যে-ক’জন খুশি স্ত্রী রাখতে পারত। মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে তাহাদের চার্চ্চ স্ত্রীর সংখ্যা ‘এক’ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। ইহুদীবাদে বহু বিবাহ অনুমোদিত। তাদের তালমুদিয় বিধান অনুযায়ী আব্রাহামের [ইব্রাহীম (আ)] তিনজন স্ত্রী ছিল এবং সলোমনের [সুলাইমান (আ)]-এর ছিল শতাধিক স্ত্রী।

বহু-বিবাহের এই প্রথা চলে আসছিল তাদের “রাব্বাঈ” জারসম বিন ইয়াহুদাহ্ পর্যন্ত। (৯৬০ সি.ই থেকে ১০৩০ সি.ই) তিনিই এর বিরুদ্ধে একটি অনুশাসন জারি করেন। ইহুদীদের ‘সেফারডিক’ সমাজ যারা প্রধানত মুসলিমদের দেশগুলোতে বসবাস করে তারা এই প্রথাকে নিকট অতীতের ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ধরে রাখে। অতঃপর ইসরাঈলের প্রধান রাব্বাঈ একাধিক স্ত্রী রাখার ওপর বিধিনিষেধ জারি করে দেয়।

উদয়: হিন্দুদের জন্য কি বহুবিবাহের অনুমতি নেই?

আবিদ: একটি লক্ষণীয় বিষয়ঃ ১৯৭৫ সালের আদম-শুমারী অনুযায়ী ভারতীয় হিন্দুরা বহু বিবাহের ক্ষেত্রে মুসলিমদের চাইতে অগ্রগামী।

কমিটি অফ দি স্টাটাস অফ ওমেন ইন ইসলাম (ইসলামে নারীর মর্যাদা কমিটি) নামে এ বইটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৫ সালে। বইয়ের ৬৬ ও ৬৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, একাধিক স্ত্রী গ্রহণ-সংক্রান্ত বিবাহ, হিন্দুদের মধ্যে শতকরা পাঁচ দশমিক শূন্য ছয় (৫.০৬%) আর মুসলিমদের মধ্যে চার দশমিক তিন এক (৪.৩১%)।

ভারতীয় আইন অনুযায়ী একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমোদন শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য নির্ধারিত। ভারতে যেকোনো অমুসলিমের জন্য একাধিক স্ত্রী রাখা অবৈধ। এটা অবৈধ হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমদের তুলনায় হিন্দুরাই একাধিক স্ত্রী বেশি রাখছে।

এর আগে তো কোনো বিধিনিষেধই ছিলনা। এমনকি হিন্দু পুরুষদের ক্ষেত্রেও একাধিক স্ত্রী রাখা অনুমোদিত ছিল। এই তো সেদিন ১৯৫৮ সালে হিন্দু বিবাহ-বিধি অনুমোদিত হলো এভাবে যে, একজন হিন্দুর জন্য একাধিক স্ত্রী রাখা অবৈধ।

বর্তমানে এটা একটা ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আইন। যা নিয়ন্ত্রিত করেছে একজন হিন্দু পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখতে- "হিন্দু ধর্ম-গ্রন্থ" নয়।

উদয়: তবে ইসলাম কেনো অনুমতি দিলো?

আবিদ: সেই কথা ই বলছিলাম।

কুরআন একাধিক বিবাহের নিয়ন্ত্রিত রূপকে অনুমতি দেয় আমি আগে যেমন বলে এসেছি ভূ-পৃষ্ঠের ওপরে কুরআনই একমাত্র ধর্মীয় গ্রন্থ যা বলে 'বিবাহ করো মাত্র একজনকে'। কথাটি জ্যোতির্ময় কুরআনের সূরা নিসার নিম্নদ্ধৃত আয়াতের অংশ-

"বিবাহ করো তোমাদের পছন্দের নারী- দু'জন অথবা তিনজন অথবা চারজন কিন্তু যদি আশঙ্কা করো যে, তোমরা (তাদের সাথে) ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ করতে না-ও পারতে পারো- তাহলে মাত্র একজন। " (৪:৩)

কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে বহু-বিবাহের কোনো মাত্রা নির্ধারিত ছিল না এবং ক্ষমতাবান প্রায় প্রতিটি মানুষ এতে অভ্যস্ত ছিল। কেউ কেউ তো শ' এর মাত্রা ছাড়ালে ক্ষান্ত হতো না।

কুরআন সর্বোচ্চ চার জনের একটা মাত্রা নির্ধারণ করে দিল। ইসলাম একজন পুরুষকে দুজন, তিনজন অথবা চারজনের যে অনুমতি দিয়েছে তা কঠিন শর্তের মধ্যে আবদ্ধ যে, কেবলমাত্র তখনই তা সম্ভব যখন তাদের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ সুবিচারমূলক আচরণ করতে পারবে।

একই সূরার ১২৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে-

“তুমি কস্মিকালেও পেরে উঠবে না স্ত্রীদের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে। ” (৪:১২৯)

কাজেই ইসলামে বহু-বিবাহ কোনো বিধান নয় বরং ব্যতিক্রম। বহু মানুষ এই ভুল ধারণায় নিমজ্জিত যে, একজন মুসলিম পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী রাখা বাধ্যতামূলক। করা এবং না করার ক্ষেত্রে ইসলামের পাঁচটি শ্রেণী-বিন্যাস করা আছে।

১. ফরজ-অবশ্য করণীয় বা বাধ্যতামূলক। ২. মুস্তাহাব-অনুমোদিত অথবা উৎসাহিত। ৩. মুবাহ-অনুমোদন যোগ্য বা গ্রহণ যোগ্য। ৪. মাকরুহ- অনুমোদিত নয় বা নিরুৎসাহিত। ৫. হারাম- বে-আইনী বা নিষিদ্ধ।

এর মধ্যে বহু-বিবাহ মধ্যম শ্রেণীতে পড়ে। অর্থাৎ অনুমোদন যোগ্য এবং কোনো ভাবে এমন কথা বলা যাবে না যে, একজন মুসলিম, যার দুজন, তিনজন অথবা চারজন স্ত্রী আছে, সে তার তুলনায় ভালো মুসলিম যার স্ত্রী মাত্র একজন।

ঘ. গড় আয়ুস্কাল পুরুষের তুলনায় নারীর বেশি প্রাকৃতিকভাবে নারী ও পুরুষের জন্মহার প্রায় সমান। একটি নারী শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা পুরুষ শিশুর চাইতে বেশী।

একটি নারী শিশু রোগ-জীবানু ও রোগ-ব্যাধির বিরুদ্ধে পুরুষ শিশুর চাইতে লড়াই করতে পারে। এ কারণে শিশুকালে নারীর তুলনায় পুরুষের মুত্যু হার বেশি।

যে কোনো যুদ্ধের সময় নারীর তুলনায় পুরুষ বেশি মারা যায়। সাধারণ দুর্ঘটনা ও রোগ-ব্যাধিতে নারীর তুলনায় পুরুষ বেশি মারা যায়।

গড় আয়ুষ্কাল পুরুষের চাইতে নারীর বেশি। মহাকালে যে কোনো যুগে খুঁজে দেখলে দেখা যাবে-বিপত্নীকের চাইতে বিধবার পরিমাণ অনেক বেশি।

ঙ. ভারতে পুরুষের জন্ম-সংখ্যা নারীর তুলনায় বেশি। এর কারণ নারী শিশুর ভ্রুণ-হত্যা ও নারী শিশু হত্যা। প্রতিবেশি কয়েকটি দেশের মধ্যে তুলনামুলক ভাবে ভারতীয় পুরুষ-জনসংখ্যা নারী-জন সংখ্যার চাইতে বেশি।

এর নেপথ্য কারণ, নারী শিশু হত্যার উচ্চ হার। প্রতি বছর নুন্যতম দশলাখ 'নারী-ভ্রূনের' গর্ভপাত ঘটানো হয় এই দেশে যখনই মায়ের গর্ভে তাকে নারী হিসাবে সনাক্ত করা যায়। যদি এই অভিশপ্ত চর্চ্চা বন্ধ করা যায় তাহলে ভারতেও পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশি হয়ে যাবে।

চ. বিশ্বব্যাপী নারী জনসংখ্যা পুরুষের চাইতে অধিক আমেরিকায় পুরুষের চাইতে সত্তুর লক্ষ আশি হাজার নারী বেশি।

✔ শুধু নিউইয়র্কে পুরুষের চেয়ে দশলাখ নারী।

✔ উপরন্তু নিউইয়র্কের এক তৃতীয়াংশ পুরুষ সমকামী। অর্থাৎ এই লোকেরা কোনা নারী-সঙ্গ বা বিবাহ করতে আদৌ আগ্রহী নয়।

✔ ইংল্যান্ডে পুরুষ জনসংখ্যার সমসংখ্যক নারী বাদ দিলে চল্লিশ লক্ষ অতিরিক্ত নারী।

✔ একই ভাবে জার্মানীতে পঞ্চাশ লাখ অতিরিক্ত নারী।

✔ রাশিয়ায় নব্বুই লাখ।

এরপর শুধু আল্লাহই বলতে পারেন গোটা পৃথিবীতে একজন পুরুষের বিপরীতে একজন নারী ধরে নিলে তারপর কত নারী অতিরিক্ত থেকে যাবে।

ছ. প্রতিটি পুরুষের জন্য মাত্র একজন স্ত্রী এই নিয়ন্ত্রণ বাস্তবতা বিবর্জিত আমেরিকার প্রতিটি পুরুষ যদি একজন করে নারীকে বিবাহ করে তারপরেও তিন কোটির বেশি নারী থেকে যাবে এমন, যারা তার জন্য কোনো স্বামী পাবে না।

উপরন্তু মনে রাখতে হবে, সারা আমেরিকায় সমকামী পুরুষের সংখ্যা দুই কোটি পঞ্চাশ লাখের বেশী। এভাবে চল্লিশ লাখের বেশি নারী ইংল্যান্ডে। পঞ্চাশ লাখের বেশি জার্মানিতে এবং প্রায় এক কোটি নারী রাশিয়ায়- যারা কোনো স্বামী পাবে না।

উদয়: তুমি কি বলতে চাচ্ছিস? ছেলে না পাওয়ার জন্যে তাদের দ্বিতীয় স্ত্রী হয়ে থাকতে হবে??

আবিদ: ধরা যাক, আমার বোন আমেরিকা নিবাসী একজন অবিবাহিতা মহিলা অথবা আপনার বোন আমেরিকায় বসবাসকারী একজন অবিবাহিতা নারী।

সেখানে তার জন্য দুটি বিকল্প পথ খোলা আছে- হয় সে এমন একজন পুরুষকে বিবাহ করবে যার একজন স্ত্রী আছে অথবা তাকে হতে হবে "জনগণের সম্পত্তি"-অন্য কিছুই হওয়া সম্ভব নয়। তাহলে যারা রুচিশীলা তারা প্রথমটাই বেছে নেবে।

অধিকাংশ নারী অন্য নারীর সাথে তার স্বামীকে ভাগাভাগি করতে রাজি হবে না। কিন্তু ইসলামে পরিস্থিতি বিবেচনায় তা-ই অপরিহার্য হয়ে ওঠে-"মুসলিম নারী তার যথার্থ ঈমানের কারণে এই সামান্য ক্ষতির বিনিময়ে অনেক বড় ক্ষতি ঠেকাতে তার আর এক মুসলিম বোনকে জনগণের সম্পত্তি হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন"।

জ. জনগনের সম্পত্তি হওয়ার চাইতে একজন বিবাহিতা পুরুষ বিয়ে করা শ্রেয় পশ্চিমা সমাজের একজন পুরুষের 'মেয়ে-বন্ধু' খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। অথবা একাধিক বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক। এক্ষেত্রে নারীরা যাপন করে মর্যাদাহীন এক অনিশ্চিত-অরক্ষিত জীবন। অথচ সেই একই সমাজ একজন পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে রাজি নয়। যেখানে নারী হতে পারতো একজন সম্মানিতা, মর্যাদাময় অবস্থানের অধিকারিণী এবং যাপন করতো নিরাপত্তাপূর্ণ নিরাপদ জীবন। যেখানে নারীর সামনে দুটি পথ খোলা। যে স্বাভাবিকভাবে কোনো স্বামী পাবেনা তাকে হয় একজন বিবাহিত পুরুষকেই বিয়ে করতে হবে নতুবা হতে হবে জনগনের সম্পত্তি।

ইসলাম পছন্দ করে নারীকে সম্মানজনক অবস্থান দিতে, প্রথম পথের অনুমোদন দিয়ে এবং ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করে দ্বিতীয়টিকে। আরো একটি ব্যাপার লক্ষনীয় যে সব পুরুষের একাধিক স্ত্রী রাখার অর্থনৈতিক বা অনেকের দৈহিক সামর্থ্য থাকেনা। আরো কিছু রয়েছে যে সবের জন্য ইসলাম নিয়ন্ত্রিত বহু-বিবাহ অনুমোদন করে। কিন্তু প্রধানত নারীর সম্মান-মর্যাদা ও সম্ভ্রম সুরক্ষাই লক্ষ্য।

উদয়: বুঝলাম। আজ উঠছি তবে। পরে কথা হবে।

১৪) স্রষ্টা যদি সব সৃষ্টি করেন,স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করল?

শাহরিয়ার:হাই মাহমুদ ভাই!কেমন আছেন?

মাহমুদ:আলহামদুলিল্লাহ ভাই

শাহরিয়ার:এই যে আপনাদের মতো মৌলবাদি মানুষেরা সব কথায় আল্লাহকে টেনে আনেন,আচ্ছা বলেন তো সব যদি সৃষ্টিকর্তাই সৃষ্টি করে থাকেন তবে তাকে কে সৃষ্টি করল?

মাহমুদ:স্রষ্টা নিজেই এমন এক সত্তা যিনি সৃষ্ট নন, তিনি অস্তিত্বে আসেন নি বরং সর্বদা অস্তত্বিশীল এবং তিনি সৃষ্টিজগতের স্থান-কাল কাঠামোর অংশ নন । আর এজন্যই তিনি অসৃষ্ট বা অবস্তু, ফলে তাঁর সৃষ্ট হওয়ার প্রয়োজন নেই ।

শাহরিয়ার:যদি স্রষ্টাকে অস্তিত্বে আনার প্রয়োজন নেই বলে ধরে নেই, তবে খোদ মহাবিশ্বের ক্ষেত্রেই একথা ধরে নেই না কেন ?

মাহমুদ:এই মহাবিশ্ব কোন জ্ঞানসম্পন্ন সত্তা নয় যে নিজেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, পরিচালনা করতে পারে। বরং মহাবিশ্বের সকল ব্যবস্থা ও সকল অংশ ইংগিত করছে যে, তা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। এজন্য কোন স্রষ্টা ব্যতীত মহাবিশ্বের স্বয়ংসর্ম্পূণ অস্তিত্বের ধারণা যৌক্তিক নয়, তাই এক্ষেত্রে একমাত্র যৌক্তিক সম্ভাবনা হচ্ছে এই যে, এর একজন জ্ঞানী স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রণকারী থাকতে হবে যিনি নিজে সৃষ্ট নন।

শাহরিয়ার:হুম...

মাহমুদ:স্রষ্টা নিজেই কুরআনে তার পরিচয় দিয়েছেন

কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ

বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়।

ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ

আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী।

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি।

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

আর তাঁর কোন সমকক্ষও নেই।

(সূরা ইখলাস:১-৪)

১৫) আল্লাহ রিজিকদাতা হলে মানুষ না খেয়ে মারা যায় কেন?

নিলয়:হাই উবাইদাহ,কেমন আছিস বন্ধু?

উবাইদাহ:আলহামদুলিল্লাহ ভালো, তুই কেমন আছিস?

নিলয়:ভালো,আচ্ছা উবাইদাহ তুই তো খুব ধার্মিক একটা প্রশ্ন করি।আল্লাহই যদি রিজিকদাতা হয় তাহলে এই যে আমরা দেখি কত মানুষ না খেয়ে আছে বা মানুষ না খেয়ে মারা যায় কেন?

উবাইদাহ:রিজিকের মালিক আল্লাহ এতে কোনো সন্দেহ নেই।আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করার আরো বহু বছর আগেই তাকদীরে সব লিখে রেখেছেন

নিলয়:আচ্ছা তাই যদি হয় তবে যারা খাবার না খেয়ে মারা যায় তাদের তাকদিরে রিজিক ছিল না??

উবাইদা:আচ্ছা শুন,

ধনীদের সম্পদে গরীবের অধিকার রয়েছে।এ সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে--

আর তাদের ধনসম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক।(সূরা যারিয়াত-১৯)।

রিজিকের জন্য নিজেদেরও চেষ্টা পরিশ্রম করতে হবে।আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন–

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا۟ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا۟ مِن رِّزْقِهِۦ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ

অর্থ:তিনিই তো তোমাদের জন্য যমীনকে সুগম করে দিয়েছেন, কাজেই তোমরা এর পথে-প্রান্তরে বিচরণ কর এবং তাঁর রিযক থেকে তোমরা আহার কর। আর তাঁর নিকটই পুনরুত্থান।(সূরা-মূলক:১৫)

আল্লাহ মানুষকে রিজিক দিয়েও পরীক্ষা করেন।

নিলয়:কিভাবে রিজিক দিয়ে পরীক্ষা করেন?

উবাইদাহ:হ্যা,রিজিক এক ধরনের পরীক্ষা।আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার জীবনে আমাদেরকে অনেক কিছুর দ্বারাই পরীক্ষা করে থাকেন, আমরা আসলে কতটা ঈমান রাখি আল্লাহর উপর।

এ সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ

অর্থ:আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।(সূরা-বাকারাহ-১৫৫)

নিলয়:বুঝলাম,কিন্তু রিজিক যদি নির্ধারিতই থাকে তাহলে কাজ করার আবশ্যকতা কি?

উবাইদাহ:ইসলাম কখনোই বলে না মানুষ হাত পা গুটিয়ে বসে থাকুক এমনিতেই রিজিক আসবে।

নিশ্চয় আল্লাহ কোন কওমের অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।(সূরা-রাদ:১১)

নিলয়:আচ্ছা এখন আমার একটু তাড়া আছে রে আসি।

১৬) ইসলামে মহিলারা কেন একই সময়ে একাধিক পুরুষকে বিয়ে করতে পারে না?

লিনা:হাই ফাতেমা!দিনকাল কেমন যাচ্ছে?শুনলাম তোমার নাকি বিয়ে হয়েছে!

ফাতেমা:জ্বি আলহামদুলিল্লাহ,কিছুদিন আগেই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় বিয়ে হলো।

লিনা:আচ্ছা ফাতেমা,ইসলাম ধর্মে একই সময়ে একজন পুরুষ নাকি একাধিক স্ত্রী রাখতে পারে তাই না?

ফাতেমা:হ্যা,আলহামদুলিল্লাহ

লিনা:তবে একই সময়ে একজন নারী কেন একাধিক পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে না।তোমাদের ধর্মে তো নাকি খুব ইনসাফ করে কিন্তু এক্ষেত্রে কিভাবে ইনসাফ হলো!!

ফাতেমা:আল্লাহ তায়ালা ইসলামে মহিলাদেরকে একই সময়ে একাধিক পুরুষকে বিয়ের অনুমতি দেন নি এর মধ্যে অনেক প্রজ্ঞা রয়েছে।

এজন্য দেখা যায় যে,পৃথিবীতে মুসলিম নারীর চেয়ে পবিত্র ও বিশুদ্ধ নারী অন্য কোন ধর্মে নেই।

একজন পুরুষের একধিক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তার পরিবারে জন্মগ্রহণকারী শিশুদের মাতা-পিতার পরিচয় খুব সহজেই পাওয়া যায়। শিশুর পিতা কে আর মাতা কে। অপরদিকে একজন নারী যদি একাধিক স্বামী গ্রহণ করে তবে এ পরিবার জন্ম নেয়া শিশুর শুধু মায়ের পরিচয় পাওয়া যাবে-বাবার নয়। পিতা ও মাতার সুস্পষ্ট পরিচয়ের ক্ষেত্রে ইসলাম আপোসহীন। আধুনিক মনোবিজ্ঞানিরা বলেন, যে শিশু তার মাতা-পিতার পরিচয় জানে না, বিশেষ করে পিতার- সে শিশু তীব্র মানসিক জটিলতা ও হীনমন্যতায় ভোগে।

ইসলামে কোনো তালাক প্রাপ্ত নারীকেও দ্বিতীয় বিয়ের পূর্বে তিন মাসের একটি গ্যাপ রাখতে বলেছেন।এর পিছনেও হিকমাহ(প্রজ্ঞা) রয়েছে।

লিনা:আচ্ছা তো এর পিছনে কি প্রজ্ঞা আছে শুনি।

ফাতেমা:আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন--

'তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন মাসিক পর্যন্ত অপেক্ষা করবে' (সূরা আল-বাকারাহ:২২৮)

তুমি তো বিজ্ঞানে বিশ্বাস করো তাই না!!বর্তমানে বিজ্ঞানীরাও গবেষণা করে দেখেছে যে, প্রথম মাসিক আসার পর একজন মহিলার শরীর থেকে (৩২%-৩৫%)পর্যন্ত প্রোটিন শেষ হয়ে যায়,

এবং দ্বিতীয় মাসিক আসার পর তার শরীর থেকে (৬৭-৭২%) ডিএনএ ধ্বংস হয়ে যায়।

আর তৃতীয় মাসিকের পর ৯৯.৯% পর্যন্ত প্রোটিন নির্মূল হয়ে যায়। এরপর জরায়ু আগের ডিএনএ থেকে সম্পন্নরূপে পরিষ্কার হয়ে যায় এবং কোন প্রকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই নতুন ডিএনএ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকে।

এজন্য যদি একই সাথে একাধিক পুরুষের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করে, তাহলে তার শরীরে বিভিন্ন ধরণের ডিএনএ জমা হয় যা বিপজ্জনক ভাইরাসের রূপ নেয় এবং মারাত্মক রোগ সৃষ্টির কারণ হয়।

বিধবা মহিলার ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান একটু ভিন্ন।

ইসলামে বিধবা মহিলার ইদ্দত তালাকপ্রাপ্ত মহিলার চেয়ে বেশি অর্থাৎ ৪ মাস ১০ দিন।

লিনা:বিধবা মহিলার জন্য ভিন্ন কেন??

ফাতেমা:এক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা হলো দুঃখ ও দুশ্চিন্তার কারণে তার শরীর থেকে প্রাক্তন স্বামীর ডিএনএ দ্রুত শেষ হয় না।

এটি শেষ হতে আগের চেয়ে বেশি সময় লাগে, এ জন্য ইসলামে বিধবা মহিলাদের ইদ্দত ৪মাস ১০ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন--

'তোমাদের মধ্য হতে যারা স্ত্রীদেরকে রেখে মারা যাবে সে অবস্থায় স্ত্রীরা নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন বিরত রাখবে।' (আল-বাকারাহ, ২৩৪)

তাই ইসলামে একজন মহিলার জন্য একই সময়ে একাধিক বিয়ে বা একাধিক স্বামী রাখার অনুমতি দেয়া হয়নি।

লিনা:হুম বুঝলাম..আজ আসি তাহলে,ধন্যবাদ।

১৭) আল্লাহ যদি অভাবগ্রস্থ না হন তাহলে ঋন চাইলেন কেন?

সামির:আচ্ছা রাহাত,স্রষ্টার কাছে তো নাকি কোনো কিছুর অভাব নেই তবে তিনি মানুষের কাছে ঋন চেয়েছেন কেন?

রাহাত:আল্লাহ তায়ালা কুরআনে সূরা বাকারাহ-২৪৫ নং আয়াতে বলেছেন-

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

অর্থ:কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, ফলে তিনি তার জন্য বহু গুণে বাড়িয়ে দেবেন? আর আল্লাহ সংকীর্ণ করেন ও প্রসারিত করেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে ফিরানো হবে।

আবার সূরা হাদিদের ১১ নং আয়াতেও আছে–

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ

অর্থ:এমন কে আছে যে, আল্লাহকে উত্তম করয দিবে ? তাহলে তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান।

এমন আরো কিছু আয়াতে আল্লাহ একথা বলেছেন।তুই এগুলো আয়াত পড়ে ভাবছিস আল্লাহ অভাবগ্রস্থ কিনা!!

সামির:হ্যা,আয়াত গুলো দ্বারা তো এটাই মনে হচ্ছে।

রাহাত:এখানে আল্লাহকে ঋন দেয়ার অর্থ হলো আল্লাহর রাস্তায় দান করা।আল্লাহ কখনোই আমাদের সম্পদের মুখাপেক্ষী নন,বরং আমাদের যে সম্পদ রয়েছে সবকিছু আল্লাহরই দেওয়া রিজিক।

আল্লাহ সুবহানুতায়ালা কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন–

* يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ

অর্থ:হে মানুষ, তোমরা আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী আর আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিত।(সূরা-ফাতির-১৫)

* ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ

অর্থ:আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী।(সূরা-ইখলাস:২)

সামির:তাহলে সরাসরি দান করার কথাই বলতে পারত ঋনের কথা বললেন কেন?

রাহাত:এটা আল্লাহ তায়ালার এখতিয়ার তিনি তার বান্দাদের উৎসাহিত করার জন্য এমন শব্দ দ্বারা উল্লেখ করেছেন।পৃথিবীর সমস্ত কিছুই আল্লাহর দেয়া উনার আমাদের সম্পদের কোনো প্রয়োজন নেই।আমরা যদি দান করি তবে আমরা তো নিজেকে এবং অন্যকেই উপকৃত করে থাকি।

সামির:আমার বুঝে হয়ত ভুল ছিল আমি সরাসরি অর্থ থেকে বুঝতে চেয়েছিলাম,ব্যাখ্যা দেখি নি,ধন্যবাদ।

১৮) কোরআনের মত কোনো বই নাকি লেখা সম্ভব না?

মিরা: কেমন আছো নাফিসা?

নাফিসা:আলহামদুলিল্লাহ ভালো, তুমি কেমন আছো?

মিরা:ভালো,

কুরআনের মত কোনো বই নাকি লিখা সম্ভব না এর কি কোনো যুক্তি প্রমান তোমার জানা আছে?

নাফিসা:কোরআনের সমতুল্য কোন বই এই পৃথিবীতে নাই । কোরআনের মিরাকলের শেষ নাই – কোরআনের বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন আয়াত, কোরআনের বিভিন্ন ভবিষ্যৎবানী, কোরআনের শব্দবিন্যাস, আরবী ভাষার উপর কোরআনের প্রভাব,

কোরআন যেভাবে সংরক্ষিত হয়ে আসছে – এই প্রত্যেকটা ব্যাপারই এত ইউনিক যে পৃথিবীর আরো কোন বইতে এই বৈশিষ্ট্যগুলো নাই।

মিরা:এর কোনো যুক্তি প্রমান কি তোমার জানা আছে? এটা সাধারণ বইয়ের মতোই কি এমন আছে যার ফলে এটা ঐশ্বরিক বানী মনে করো তোমরা?

নাফিসা:আয়াতের দিক থেকে কোরআনের অন্যতম ছোট সূরা হলো সূরা ইখলাস। প্রায় ১৪০০ বছর আগের সেই দিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অসংখ্য মানুষ এই সূরাটি পড়েছে, পড়ছে, মুখস্থ করেছে, করছে, ঠিক সেই উচ্চারণে যেই উচ্চারণে এটি প্রথমবার মানুষ শুনেছিলো।

এখন কেউ পারলে এরকম চারটি লাইন অন্য কোনো বই থেকে এনে দেখান যেটা হাজার বছর ধরে মানুষ এত গুরুত্বের সাথে আমল করছে।

এই চ্যালেঞ্জ কার্যকর কেউই করতে পারবে না।

মিরা: তাহলে তুমি বলতে চাইছ কুরআনের যে বানী আছে এর মতো কিছু লিখা মানুষের পক্ষে সম্ভব না!এটা তোমাদের নবির লিখা বই না?

নাফিসা: না কুরআন সম্পূর্ন ঐশ্বরিক কিতাব স্বয়ং কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا۟ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ

অর্থ:নাকি তারা বলে, ‘সে(মুহাম্মাদ ﷺ)

তা বানিয়েছে’? বল, ‘তবে তোমরা তার মত একটি সূরা (বানিয়ে) নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পারো ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও’।(সূরা ইউনুস:৩৮)

وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا۟ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ

অর্থ:আর আমি আমার বান্দার উপর যা নাযিল করেছি, যদি তোমরা সে সম্পর্কে সন্দেহে থাক, তবে তোমরা তার মত একটি সূরা নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সাক্ষীসমূহকে ডাক; যদি তোমরা সত্যবাদী হও।(সূরা বাকারাহ:২৩)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘তবে কি তারা কোরআন সম্পর্কে অনুধাবন করে না? এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে আসত, তবে তারা তাতে বহু অসংগতি খুঁজে পেত।

মিরা: ধন্যবাদ, প্রমাণসহ কুরআন এর আয়াত আমাকে বলার জন্য।

১৯) বিষয়: ইসলামে শূকর খাওয়া হারাম কেন? অথচ শূকর আল্লাহরই একটি সৃষ্টি। হারামই যদি হয় তাহলে আল্লাহ শূকরকে সৃষ্টি করলেন কেন?

আদিত্য:কেমন আছেন নিলয় ভাই?

নিলয়:আলহামদুলিল্লাহ,আপনি কেমন আছেন?

আদিত্য:জ্বি ভালো আছি।

আপনাকে দাওয়াত আমাদের সামনে একটা পার্টি আছে,আমরা বন্ধুরা মিলে আমাদের স্পেশাল ডিশ বানাবো।

নিলয়:আচ্ছা কি তোমাদের স্পেশাল ডিস?

আদিত্য:আমরা বড় একটা শূকর ধরে এনেছি এটাকে বার-বি-কিউ করব।

নিলয়:মাআযাল্লাহ(আল্লাহর পানাহ চাই)আমি তো শূকর খাই না,ইসলামে শূকর খাওয়া হারাম।

আদিত্য:আচ্ছা ভাই ইসলামে শূকর খাওয়া হারাম কেন?

নিলয়:মহান প্রতিপালক আমাদের জন্য শূকর খাওয়া অকাট্যভাবে নিষিদ্ধ করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন--

বল, ‘আমার নিকট যে ওহী পাঠানো হয়, তাতে আমি আহারকারীর উপর কোন হারাম পাই না, যা সে আহার করে। তবে যদি মৃত কিংবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের গোস্ত হয়- কারণ, নিশ্চয় তা অপবিত্র কিংবা এমন অবৈধ যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য

যবেহ করা হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে তা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে, তাহলে নিশ্চয় তোমার রব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।(সূরা আনআম: ১৪৫)

যারা অনুসরণ করে রাসূলের, যে উম্মী নবী; যার গুণাবলী তারা নিজদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত পায়, যে তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেয় ও বারণ করে অসৎ কাজ থেকে এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে আর অপবিত্র বস্তু হারাম করে। আর তাদের থেকে বোঝা ও শৃংখল- যা তাদের উপরে ছিল- অপসারণ করে। সুতরাং যারা তার প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং তার সাথে যে নূর নাযিল করা হয়েছে তা অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।(সূরা আরাফ: ১৫৭)

আদিত্য:শূকর তো আল্লাহরই সৃষ্টি তবে..

নিলয়:শূকর নাপাক ও নিকৃষ্ট প্রানী এ ব্যাপারে আমরা এক মূহুর্তের জন্যও সন্দেহ পোষণ করি না।

শূকর ময়লা আবর্জনা খেয়ে জীবন ধারন করে।

এর গোশত মানবদেহের জন্য ক্ষতিকারক,বিভিন্ন ধরনের মারাত্নক রোগ সৃষ্টির কারন হতে পারে।

আদিত্য: তবে সৃষ্টিকর্তা শূকর সৃষ্টি করলেনই কেন?

নিলয়:আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে এমন অনেক কষ্টদায়ক বা অপবিত্র বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং এর পিছনে অনেক হিকমাহ (প্রজ্ঞা) রয়েছে।

আদিত্য:তাহলে এটাকে মানুষের জন্য হারাম কেন করেছেন?

নিলয়:সৃষ্টিকর্তার এই অধিকার অবশ্যই রয়েছে যে তিনি তার বান্দাদের যা খুশি নির্দেশ করবেন,এ ব্যাপারে সমালোচনার অবকাশ নেই।

তাই মাখলুক হিসেবে আমাদের কর্তব্য হলো শুনলাম এবং মানলাম।

আদিত্য:হুম.. ঠিক আছে আজ আসি তাহলে পরে কথা হবে ভাই।

২০) আল্লাহ যদি সর্বশক্তিমান এবং পরম করুনাময় হন, তাহলে পৃথিবীতে এত দু:খ-কষ্ট কেন?

নীলা:হাই,কেমন আছিস খাদিজা?

খাদিজা:আলহামদুলিল্লাহ ভালো, তুই কেমন আছিস?

নীলা:ভালো আছি,আচ্ছা খাদিজা -আল্লাহ যদি সর্বশক্তিমান আর পরম করুনাময় হয়ে থাকেন তবে পৃথিবীতে এতো দুঃখ কষ্ট কেন বলতে পারো?

খাদিজা:পৃথিবীতে দুঃখ-কষ্ট থাকলেও পৃথিবীতে অনেক আনন্দও আছে। বরং, পৃথিবীতে আনন্দই বেশী, নাহলে অধিকাংশ মানুষ বেঁচে থাকতে চাইত না।

নীলা:তোর কাছে মনে হয় আনন্দ বেশি?

খাদিজা:অবশ্যই আল্লাহ কুরআনে বলেছেন–

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِىَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

অর্থ:বলুন, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জন্য যে সব সুশোভন বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, তা কে নিষিদ্ধ করেছে? বলুন, এসব তো ঈমানদারদের জন্য – পার্থিব জীবনে এবং বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে।এভাবে আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি এমন কওমের জন্য, যারা জানে।

(সূরা আ'রাফ:৩২)

নীলা:দুঃখবোধও অনেক আছে যা সহ্য করতে না পেরে মানুষ আত্নহত্যাও করে এটাকে তুই কিভাবে নিবি!

খাদিজা:আমরা যতটুকু সহ্য করতে পারব ততটুকু বোঝাই আল্লাহ আমাদের উপর দেন এর বেশি না।দেখ আল্লাহ কুরআনে সূরা বাকারাহর ২৮৬ নং আয়াতে বলেছেন-

"আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। সে যা অর্জন করে তা তার জন্যই এবং সে যা কামাই করে তা তার উপরই বর্তাবে। হে আমাদের রব! আমরা

যদি ভুলে যাই, অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব, আমাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দেবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না, যার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর আপনি আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আর আমাদের উপর দয়া করুন। আপনি আমাদের অভিভাবক। অতএব আপনি কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।"

নীলা:হুম...

খাদিজা: আল্লাহ্ আমাদের বিভিন্ন কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলেন, যাতে আমরা শিক্ষাগ্রহণ করতে পারি এবং কঠিনতর পরিস্থিতির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারি

*তিনি (আল্লাহ্) বললেন: আমি যা জানি তোমরা তা জান না। (সূরা বাক্বারাহ্:৩০)।

এই পৃথিবীটা হলো একটা পরীক্ষার জায়গা। আল্লাহ্ বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করছেন। এই পরীক্ষা আনন্দদায়ক হতে পারে, আবার কষ্টেরও হতে পারে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

নিশ্চয়ই আমি তোমাদের (কাউকে) ভয় ও ক্ষুধা দিয়ে, আর (কাউকে) ধনেপ্রাণে বা ফলফসলের ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে পরীক্ষা করব। আর যারা ধৈর্য ধরে তাদের তুমি সুখবর দাও। (তারাই ধৈর্যশীল) যাদের ওপর কোন বিপদ এলে বলে,

নিশ্চয় আমরা আল্লাহরই জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তারই দিকে ফিরে যাব'। এদের উপর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে শান্তি ও করুণা বর্ষিত হয় এবং এরাই সুপথগামী। (সূরা-বাক্বারাহ:১৫৫-১৫৭)

নীলা:তোর কথা মতো পরীক্ষা তো বুঝলাম তবে এতো কঠিন কেন?

খাদিজা:শুন তোর এই প্রশ্নের উত্তরও আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন কুরআনে—-

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ

যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতিশয় ক্ষমাশীল।(সূরা মুলক-২)

*আর পার্থিব জীবন তো ক্রীড়াকৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয়; আর সাবধানীদের জন্য পরকালের আবাসই ভালো; তোমরা কি বোঝ না? – (সূরা আন'আম:৩২)

নীলা:আচ্ছা তোর কথা আমি ভেবে দেখব।

খাদিজা:এগুলো আমার কথা না কুরআনের কথা

নীলা:আচ্ছা যাই হোক এখন যাই..

নাস্তিককে আস্তিক এ পরিণত করার উপায় উপায়:

আমরা সবাই আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তান। সুতরাং আদম সন্তান হিসাবে

আমার এক ভাই বা বোন নাস্তিক হওয়ার কারণে চিরস্থায়ী জাহান্নাম এ যাবে। তার এ জাহান্নাম এর পথে হাটা মুসলিম হিসাবে একদিকে যেমন আমাদের জন্য অন্তর্দহন ও মর্মপীড়ার তেমনি অপরদিকে তার মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের বিষোদগার অসহনীয় মন: কষ্ট এর কারণ। এ থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য নাস্তিক কে আস্তিক বানানো ছাড়া কোন উপায়ন্তর নাই। হেদায়েত কেবল আল্লাহ তায়ালাই দেন তবে মুসলিম হিসাবে আমাদের কে চেষ্টা করতে হবে দাওয়াহ দেওয়ার। আল্লাহ তায়ালা চাইলে নিম্নোক্ত উপায় এ অবিশ্বাসীকে বিশ্বাসী তে পরিণত করা সম্ভব-

স্রষ্টার অস্তিত্ব এর প্রমাণ:

নাস্তিকরা সৃষ্টিকর্তার (আল্লাহর) অস্তিত্বে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস রাখেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহারা যুক্তিবাদী হন। অর্থাৎ প্রমাণে বিশ্বাসী। যেহেতু কোনো প্রমাণ প্রত্যক্ষ করতে পারেন না, তাই এরকম অবিশ্বাসী চিন্তাধারা। কেবল সৃষ্টিকর্তার (আল্লাহর) অস্তিত্ব নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে দিতে হবে । তাহলেই আল্লাহ তায়ালা চাইলে সে নাস্তিক থেকে আস্তিক এ পরিণত হবে।

আল্লাহর সাহায্য ও হেদায়েত :

কুরআন শরীফ এর ৩৬ নাম্বার সূরা ইয়াসিন এর আয়াত এ (৪ থেকে ১২) কারিমায় আল্লাহ তায়ালা বলেছেন -

৪) তুমি (প্রতিষ্ঠিত রয়েছো) সরল পথের ওপর,

৫) পরাক্রমশালী,পরম দয়ালু (আল্লাহ তাআলা)-এর কাছ থেকেই এ(কোরআনের) অবতরণ;

৬) যাতে করে (এর মাধ্যমে)তুমি এমন একটি জাতির লোকদের সতর্ক করে দিতে পারো ,যাদের বাপদাদাদের (ঠিক এভাবে) সতর্ক করা হয়নি ফলে তারা গাফেল (রয়ে গেছে)।

৭) তাদের অধিকাংশ লোকের ওপরই (আল্লাহ তাআলার)বিধান অবধারিত হয়ে গেছে ,তারা (কখনো)ইমান আনবে না।

৮) আমি ওদের গলদেশসমূহে বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি,অতপর তা তাদের চিবুক পর্যন্ত ঢেকে দিয়েছে, ফলে তারা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আছে।

৯) আমি তাদের সামনে পেছনে (অন্ধকারের) প্রাচীর দঁাড় করিয়ে দিয়েছি তাদের (দৃষ্টি) ঢেকে দিয়েছি, ফলে তারা দেখতে পায় না ।

১০) (এ অবস্থায়)তুমি তাদের (আল্লাহর আযাব সম্পর্কে) সাবধান করো বা না করো উভয়টিই তাদের জন্য সমান কথা, তারা ঈমান আনবে না।

১১) তুমি তো কেবল এমন লোককেই সতর্ক করতে পারো যে আমার উপদেশ মেনে চলে এবং দয়াময় আল্লাহ তাআলা কে গায়ব থেকে ভয় করে ,(যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা কে ভয় করে)তাকে তুমি ক্ষমা ও মহা প্রতিদানের সুসংবাদ দান করো।

১২) আমিই মৃতকে জীবিত করি তারা যা কিছু আমল (আল্লাহর কাছে) পাঠিয়ে দিয়েছে সেগুলোকে আমি যথাযথ লিখে রাখি, নিজেদের (কর্মকান্ডের) চিহ্ন হিসেবে যা কিছু তারা (দুনিয়ায়) রেখে যায় তাও আমি (লিখে রাখি),প্রতিটি জিনিসকে আমি একটি সুস্পষ্ট কিতাবে গুনে গুনে (জমা করে) রেখেছি।

কোরআনের ২৯ নাম্বার সূরা আল আনকাবুত এর ৪২ থেকে ৪৪নাম্বার আয়াত:

৪২)এরা আল্লাহর পরিবর্তে সেসব কিছুকে ডাকে, আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন ;তিনি মহাপরাক্রমশালী প্রবল প্রজ্ঞাময়।

৪৩)এ হচ্ছে (সেই)উদাহরণ ,যা আমি মানুষদের জন্যেই পেশ করি, জ্ঞানী ব্যক্তিরা ছাড়া কেউ তা বুঝতে পারে না।

৪৪) আল্লাহ তাআলা আসমানসমূহ ও যমীন যথাযথভাবেই সৃষ্টি করেছেন ;(বস্তুত)এতে ঈমানদারদের জন্যে (আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের)অনেক নিদর্শন রয়েছে।

তাই আমরা আস্তিকরা আয়াত গুলো থেকে স্পষ্ট হতে পারি বিশেষ করে ৬,১০,১১আয়াতগুলো থেকে বুঝা যায় তাদের শুধু আমরা সতর্ক করতে পারি আল্লাহ তাআলার হেদায়েত ছাড়া তারা কখনো আস্তিক হতে পারবে না।

গবেষণার ফলাফল ও সিদ্ধান্ত

নাস্তিকতা এবং বিশ্বাস ও ধর্ম:

প্রত্যেকেই কোনো না কোনো ধর্মের অনুসারী। কেউ ধর্ম হিসাবে প্রচলিত কোনো বিশেষ ধর্মের অনুসারী। কেউ হয়ত প্রথাগত ধর্মে বিশ্বাসী নয়। কিন্তু সেও দিনশেষে বিশ্বাসী। যেমন নাস্তিকেরা মানবধর্মে বিশ্বাসী। এটা সেই প্রচলিত কথার মতো - "we have to believe to live, no matter what we believe". যেন বিশ্বাস না করাটাও অন্টোলজিক্যালি একটা বিশ্বাস। যেমন বস্তুবাদীরা বিশ্বাস করে, বস্তুবাদ সঠিক। অর্থাৎ তারা বিশ্বাস করে যে বিশ্বাস বলে কিছু নাই! উল্লেখ্য, বস্তুতে সবাই বিশ্বাস করে। যদিও কেউ কেউ বিশ্বাস করে, শেষ পর্যন্ত যা আছে তা বস্তু। অথবা, তারা হয়তো মনে করে, বিশ্বাস হচ্ছে বস্তু হতে উৎসারিত, বা বস্তুর গুণ বিশেষ।

আস্তিক ও নাস্তিক এর মাঝে পার্থক্য:

- একজন আস্তিক ও নাস্তিকের মাঝে পার্থক্য খুবই অল্প। নিম্নোক্ত উদাহরণ এর সাহায্যে পার্থক্যটি স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হল- "keya বা aeromatics সাবানের এ্যড দেখেছেন?ঐ যে হাতের কোন স্পর্শ ছাড়াই স্বয়ংক্রিয় মেশিনে তৈরি। সাদা চোখে দেখলে সব সাবান কোন মানুষ বা কোন প্রানীর সাহায্য বা ভুমিকা ছাড়াই কি সুন্দর অটোমাটিক প্রস্তুত হচ্ছে। নাস্তিকেরা গোটা বিশ্বব্যবস্থকে দেখে সেভাবে। সব কিছু কিছুতো সিস্টেমিটাকালি হচ্ছে। এখানে কোন বুদ্ধিমান সত্ত্বার অস্তিত্ব কই?

  কিন্তু একজন গভীর অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন সম্পন্ন লোক ঐ স্বয়ংক্রিয় মেশিনের পিছনে দেখেন মানুষের ভুমিকা। মানুষ সেটি তৈরি করে প্রোগ্রাম সেট করে দেয়াতেই মেশিনটি এত সুচারুভাবে চলছে। নইলে একটা জড় মেশিনের কী সাধ্য এত সুনিয়ন্ত্রিতভাবে আপনাআপনি সব কাজ করার!একজন আস্তিক ভাবেন এই গোটা বিশ্ব নিশ্চয়ই কোন একজন মহামহিম বিজ্ঞ স্রষ্টা সুপরিকল্পিতভাবে তৈরি

করেছেন।

নাস্তিক দেখেন,বৈজ্ঞানিক ভাবে পানি থেকে মেঘ হচ্ছে,সেখান থেকে বৃষ্টি। সেই বৃষ্টি পাহাড় থেকে নেমে নদী হয়ে সাগরে মিশেছে। এতে কোন খোদার অস্তিত্ব তো দেখা যায়না।

আস্তিক ভাবেন এক বুদ্ধিমান খোদা এমন ভাবে সফটওয়্যার করে দিয়েছেন বলেইনা সব সুনিপুনভাবে হয়ে যাচ্ছে । নইলে জড় কি পারে নিজেকে পরিকল্পনামাফিক এমন করে সাজাতে!"

নাস্তিকতা ও সর্বাত্মকবাদ:

মানুষ জন্মগতভাবে, প্রকৃতিগতভাবে, স্বরূপত, প্রতি মুহূর্তেই অন্তর্গত চিন্তা-চেতনার দিক থেকে আপাদমস্তক আস্তিক। যদিও নানা কারণে কখনো কখনো সে, বা কেউ কেউ প্রথাগত ধর্মে অবিশ্বাসী হয়ে উঠে। কারো ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে, কারো ভালোবাসা হারিয়ে মানুষ যেমন আত্মহত্যার মতো ভুল করে বসে, ঠিক তেমনই নাস্তিকতার কারণ যা-ই থাকুক না কেন, শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, প্রতারিত হয়। একজন সত্যিকারের জীবনবাদী মানুষ কখনো নাস্তিক হতে পারে না। যদি সেটা হয়, তাহলে বুঝতে হবে, মোস্ট সারপ্রাইজিংলি, অন্য সব ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে তিনি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পরোপকারী ও সৎ আত্মহত্যাকারী যেভাবে চূড়ান্ত মুহূর্তে ভুল করে বসে।

নাস্তিকতার ধরন:

- একগুঁয়ে ও পক্ষপাতদুষ্ট স্বভাবের হয়ে থাকে ।
- গভীর জ্ঞান এর অভাব।

“আল্লাহর বান্দাদের মাঝে কেবল জ্ঞানীরাই তাকে ভয় করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল” (আয-যুমার, ৩৯:৯)

- বুদ্ধিহীনতা :
- চরিত্রহীনতা:

পরকালে বিশ্বাসী না হওয়ায় জাহান্নামের আগাছা শাস্তির ভয় করে না। তাই কারও কারও মধ্যে চরিত্রহীনতা প্রকাশ পায়।

- নৈতিকতা: ধর্মহীন হওয়ার কারণে তাদের অধিকাংশ এর মধ্যে নৈতিকস্খলন ঘটে।
- ধর্ম: নাস্তিকরা ধর্ম না মানলেও ধর্ম সম্পর্কে বেশ সচেতন।
- ধর্মীয় বিধি বিধান ও শখ : ধর্মীয় বিধি বিধান না মানায় স্রষ্টার ইবাদত এ সময় কাটায় না। শখের কাজ এর মাধ্যমে সময় অতিবাহিত করে।

কুরআন মাজীদ এর নিম্নোক্ত আয়াত এর অর্থ ও ব্যাখার মাধ্যমে নাস্তিকদের কিছু ধরন স্পষ্টরুপে প্রকাশ পায়।

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي ؕ اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ
اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ؕ الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

যে ব্যক্তি রাতের প্রহরে সিদজাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রব-এর রহমত প্রত্যাশা করে (সে কি তার সমান যে এরূপ করে না) বল, ‘যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?’ বিবেকবান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।

Bangla - Tafsir Ahsanul Bayaan

যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সিজদাবনত হয়ে এবং দাঁড়িয়ে ইবাদত করে, পরকালকে ভয় করে এবং তাঁর প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, (সে কি তার সমান, যে তা করে না?)[১] বল, ‘যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? [২] বুদ্ধিমান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।’[৩]

[১] উদ্দেশ্য হল যে, কাফের ও মুশরিকের তো এই অবস্থা যা বর্ণনা করা হল। পক্ষান্তরে আর এক ব্যক্তি যে সুখে-দুঃখে, আল্লাহর সামনে অক্ষমতা ও আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে সিজদা ও কিয়াম অবস্থায় রাত্রি যাপন করে। তার মন আখেরাতের ভয়ে ভীত এবং সে প্রভুর রহমতের আশাধারী হয়। অর্থাৎ ভয় ও আশা উভয় অবস্থাই তার মধ্যে পাওয়া যায়; যা প্রকৃত ঈমান। এরা দুইজন কি সমান হতে পারে? না, কক্ষনই না। ভয় ও আশা সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আনাস (রাঃ) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুত্যু মুখে পতিত এক ব্যক্তির নিকট গেলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার অবস্থা কি?" সে ব্যক্তি বলল, 'আমি আল্লাহর নিকট আশা রাখছি এবং স্বকৃত পাপের জন্য ভয়ও করছি।' রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "এই অবস্থায় যদি কোন বান্দার মনে এই দু'টি কথা একত্রিত হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে ঐ বস্তু প্রদান করবেন, যে বস্তুর সে আশা করে এবং সেই বস্তু থেকে বাঁচিয়ে নেবেন, যার সে ভয় করে।" (তিরমিযী -ইবনে মাজাহ)

[২] অর্থাৎ, সেই ব্যক্তি যে জানে যে, আল্লাহ শান্তি ও শাস্তির যে ওয়াদা করেছেন তা সত্য এবং ঐ ব্যক্তি যে এ কথা জানে না, এরা দুইজন সমান হতে পারে না। একজন বিজ্ঞ এবং অপরজন অজ্ঞ। যেমন শিক্ষা ও মূর্খতা এক নয়, অনুরূপ শিক্ষিত ও মূর্খ সমান নয়। হতে পারে যে, এখানে আলেম ও জাহেলের উদাহরণ দিয়ে এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, যেমন এরা দুইজন সমান নয়, অনুরূপ আল্লাহর বাধ্য ও অবাধ্য বান্দা, দুইজনে সমান হতে পারে না। কেউ কেউ এর অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, আলেম (জ্ঞানী) বলে ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে তার ইলম (জ্ঞান) অনুযায়ী আমল করে। কারণ সেই (প্রকৃত আলেম যে তার) ইলম দ্বারা উপকৃত হয়। আর যে নিজ ইলম

অনুযায়ী আমল করে না, সে ঠিক যেন অজ্ঞ। এই অর্থ অনুযায়ী এখানে আমলকারী ও বেআমল ব্যক্তির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যে, এরা দুইজন এক সমান নয়।

[৩] যারা মু'মিন, কাফের নয়; যদিও তারা নিজেদেরকে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ভাবে। যখন তারা নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা চিন্তা-ভাবনাই করে না এবং শিক্ষা ও নসীহতই অর্জন করে না, তখন তারা ঠিক যেন চতুষ্পদ জন্তুর মত জ্ঞান-বুদ্ধি থেকে বঞ্চিত।

সাধারণত নাস্তিকরা যে দেশে বসবাস করে সে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠদের ধর্মের সমালোচনা বেশি করে থাকে। কারণ সেই দেশের সমাজ ব্যাবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠদের ধর্মের প্রভাব বেশি থাকে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সেটা ইসলাম। ভারতের ক্ষেত্রে সেটা সনাতন ধর্ম। আমেরিকার ক্ষেত্রে সেটা খ্রিষ্ট ধর্ম।

যে দেশে বসবাস করে সে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠদের ধর্মের সমালোচনা বেশি করে থাকে। কারণ সেই দেশের সমাজ ব্যাবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠদের ধর্মের প্রভাব বেশি থাকে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সেটা ইসলাম। ভারতের ক্ষেত্রে সেটা সনাতন ধর্ম। আমেরিকার ক্ষেত্রে সেটা খ্রিষ্ট ধর্ম।

উপসংহার

اَفِي اللهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ.

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ব্যাপারে কি তোমরা সন্দেহের মধ্যে রয়েছ? (সূরা ইবরাহীম - ১০)

নাস্তিকরা সুপ্ত অবস্থার আস্তিক। সিংহভাগ নাস্তিকই কেবল নাস্তিক-পক্ষপাতদুষ্ট তথ্যগুলো দেখে। বস্তুবাদ এ বিশ্বাসী সৃষ্টিকর্তায় অবিশ্বাসী। কারণ তারা বস্তুবাদের নীরিক্ষে সব কিছুকে বিচার করে। ফলে স্রষ্টা কে ঘিরে তাদের নানা প্রশ্ন। সৃষ্টি কর্তার সাথে কুরআন এর সম্পর্ক নিবিড়। নাস্তিকদেরকে কুরআনের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। তাহলে স্রষ্টাকে খুঁজে পাবে। আল্লাহ তাআলা চাইলে আস্তিক হয়ে সীরাতুল মুস্তাকিম এর পথে চলবে।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন থিউরী উল্টে গেছে, কিন্তু পবিত্র কুরআনে বর্ণিত কোন থিউরীই উল্টানো যায়নি। যা প্রমাণ করে পবিত্র কুরআন, কোন মানবরচিত গ্রন্থ নয়। বরং স্রষ্টার নাজিলকৃত কিতাব। এরকম আরো অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। যা যেকোন বিবেকবান ব্যক্তিকে ইসলাম ধর্মই একমাত্র অবিকৃত ও ঐশী ধর্ম বলে প্রমাণ করবে। তারপরও যদি কারো ইসলাম ধর্মকে সত্য ধর্ম হিসেবে মানতে সমস্যা হয়, তাহলে তাকে কপালপোড়া এবং হতভাগা ছাড়া আর কী'বা বলা যায়।

আস্তিক ব্যক্তিরা নাস্তিক হওয়া থেকে রক্ষা পেতে বদ্বীনী জীবন, ফাসিক ব্যক্তির সংশ্রব ও তাদের রচিত পুস্তকাদি ত্যাগ করতে হবে। কারণ এগুলো ঈমানের জন্য বিপদজনক। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাদের ঈমানকে হিফাযত করবেন। আর সর্বদা দুআ করতে হবে -

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ [৩:৮

"হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্যলংঘনে প্রবৃত্ত করোনা এবং তোমার নিকট থেকে আমাদিগকে অনুগ্রহ দান কর। তুমিই সব কিছুর দাতা।" [সূরা আলেইমরান-৩: ৮]

গ্রন্থপঞ্জি

বই:

আরিফ আজাদ,(২০১৯),প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ, গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স।

মুহাম্মদ সিদ্দিক, (২০০২) নাস্তিকতার যুক্তি খন্ডন (নাস্তিকতার যুক্তিসমূহ খন্ডন ও ইসলামী আদর্শের উপর আক্রমণ জবাব), মদীনা প্রকাশনী।

ড. মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান আরিফী, আত্মবিশ্বাস

মাসিক আল কাউসার

বই-আত্নবিশ্বাস

বই-সত্যকথন (১-৩০০ পর্ব) www.sottokothon.com

www.response-to-anti-islami.com

নাস্তিকদের প্রশ্নের জবাব | চিন্তাশীল মুসলিমের ব্লগ

আহমাদ বিন হাম্বল, আল মুসনাদ, বেরুত: আর রিসালাহ পাবলিকেশন স,২০০১)। হাদিস নং ২১১৮৯

আহমাদ বিন হাম্বল, আল মুসনাদ, বেরুত: আর রিসালাহ পাবলিকেশন স,২০০১)। হাদিস নং ২১১৮৮

আত তাবারানী, মু'জামুল কাবির, (কায়রো: মাক্তাবা ইবন তাইমিয়া,১৯৯৪) হাদিস নং ৯১৫০

আস সুয়ুতি, আল ইকতান, খণ্ড ১, ইবন আদিল আল হাম্বলী, আল বাব ফি উলুমুল কিতাব, বেরুত: দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ,১৯৯৮) খণ্ড ১,

আস সুয়ুতি, আল ইকতান, (কায়রো হাইয়া আল মিসরিয়্যাহ ১৯৭৪) খণ্ড ১, ২৭১

আল খিফাজী, ইনায়া আল কাযি ওয়া কিফায়া আর রাজি 'আলা তাফসিরুল বাইযাওয়ি, (বেরুত, দারুস সদর), খণ্ড -১, হাদিস নং ৯১৫০

মু' আল্লাল বা ত্রুটিপূর্ণ বর্ণণার ব্যাপারে জানতে পাওয়া যায় : Ibn as- Salah, An Itroduction to the Science of Hadith, Translated by Dr. Erik Dickinson(Berkshire: Garmet Publishing Ltd.., 2006)pagepage 57 & 67

ইবন হাজম, আল মুহাল্লা (বেরুত), খণ্ড -১,

পত্রিকা :

নওমুসলিমদের কথা, কোরআনকে চ্যালেঞ্জ করতে গিয়ে মুসলিম হন গ্যারি মিলার,

কালের কণ্ঠ ২০ জানুয়ারি ২০২১

ইন্টারনেট:https://islamicask.com/category/knowledge-and-invitation/dawah/dr-zakir-naik-qna/

০৬ ই নভেম্বর, ২০১৫

https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/Parvejmolla/30083989

আস্তিক ও নাস্তিক্যবাদের দর্শন: পর্ব – ৪/ সৈয়দ রনো

18 October 2020

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111572600/